মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জীবন দর্শন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৪৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

فلسفة الحياة
تأليف: د. محمد أسد الله الغالب
الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশকাল
রবীউল আউয়াল ১৪৩৪ হিঃ
মাঘ ১৪১৯ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খ্রিঃ

মুদ্রণ
উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Jibon Darshan by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365, 01835-423410.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

মাননীয় লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শন-এর উপর আলোচনা করেছেন। যা মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ আকারে বিভিন্ন সময়ে বের হয়েছে। বিষয়বস্তুগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে 'জীবন দর্শন' নামে বই আকারে প্রকাশ করলাম। আশা করি এগুলি জ্ঞানী মানুষের চিন্তার খোরাক হবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চলার পথের পাথেয় হবে।

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সুচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

১. তাওহীদ দর্শন[১]

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র একক পরিকল্পনায় সৃষ্ট ও একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত, এ বিশ্বাসই হ'ল তাওহীদ দর্শন। বিশ্বচরাচরের উদ্ভাবন ও পরিচালনায় আল্লাহ্র কোন শরীক ও সহযোগী নেই। তিনি অদৃশ্যে থেকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে এনেছেন। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বভাবধর্ম ও পরিচালনার বিধান দিয়েছেন। সে মোতাবেক চলছে সকল সৃষ্টি আপনাপন গতিপথে ও বিধিবদ্ধ নিয়মে। যার কোন ব্যত্যয় নেই, ব্যতিক্রম নেই। নভোমণ্ডলের তারকারাজি চলছে জ্যোতি বিলিয়ে স্ব স্ব কক্ষপথে। বায়ু প্রবাহ চলছে মৃদুমন্দ বাতাস ছড়িয়ে। মেঘমালা ছুটে চলেছে নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। নদী-সাগর চলছে অদৃশ্য জোয়ার-ভাটার টানে সুসংবদ্ধ শৃংখলার মধ্যে। মিষ্ট পানি ও তীব্র লোনায় তিক্ত সমুদ্রের দু'টি স্রোতধারা চলছে পাশাপাশি। অথচ কেউ কারু মধ্যে মিশে যাচ্ছে না। দুপুরের ঝকঝকে রোদ হারিয়ে যাচ্ছে বিকালের পড়ন্ত বেলায়। অতঃপর মুখ লুকাচ্ছে সাঁঝের আঁধারে। তারপর হারিয়ে যাচ্ছে গভীর রাতের নিকষ কালো চাদরে। আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে প্রভাত সমীরণের সস্নেহ পরশে। অতঃপর আলস্য ঝেড়ে বেরিয়ে পড়ছে সকালের কাঁচা রোদের বিস্তীর্ণ সৈকতে। ঘুমন্ত ভূমণ্ডল মুখর হয়ে উঠছে কর্মচাঞ্চল্যে। সবই চলছে অদৃশ্য বিধায়কের সুনিপুণ বিধান মতে। যদি বিধায়ক একাধিক হ'ত এবং বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকত, তাহ'লে সৃষ্টিজগতের সকল শৃংখলা বিনষ্ট হ'ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান কোনকিছুরই অস্তিত্ব থাকত না। একই রোগ লক্ষণে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যেকোন রোগীর একই ঔষধে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে। একই সৌর বিধান পুরা সৌরলোকে কার্যকর থাকায় সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ সহজ হচ্ছে। একই জীব বিজ্ঞানে সকল জীব বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ও বিধান দাতা পৃথক হ'লে এই ব্যবস্থাপনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। 'যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু মা'বূদ থাকত, তাহ'লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত' *(আম্বিয়া ২১/২২)*।

---

১. আত-তাহরীক ১৪তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১০।

অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে, তাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তার প্রভু ও প্রতিপালককে চেনার জন্য এবং তার নিজের ভাল-মন্দ বুঝার জন্য। কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয়, যে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের যথার্থ নির্দেশনা দিতে পারে। সেকারণ মহান আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে তাঁর বিধানসমূহ নাযিল করেছেন। সবশেষে আদেশ-নিষেধ, ইতিহাস-উপদেশ ও বিজ্ঞান সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আত প্রেরণ করেছেন এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এককভাবে মানব জাতির জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ *(আহযাব ৩৩/২১)* হিসাবে পেশ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত ইসলামী বিধানই মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও পালনীয় বিধান। 'ইসলামের বাইরে কোন দ্বীন আল্লাহ কবুল করবেন না' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। আল্লাহ এক, তাঁর শেষনবী এক, তাঁর প্রেরিত বিধান এক। এই এক-এর বাইরে কোন দুই নেই। আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই এক-এর কাছে, যিনি অদৃশ্যে আছেন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। দুনিয়াবী চক্ষুকে দুনিয়াতে যাকে দেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যেমন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি দেহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আত্মাকে দেখার। অথচ রূহের বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে নিজের অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট থাকে না।

প্রাণীজগতের সর্বত্র একই জৈববিধান কার্যকর থাকায় সর্বত্র যেমন ঐক্য ও শৃংখলা বিরাজ করছে, মানুষের সমাজ জীবনের সর্বত্র তেমনি একক এলাহী বিধান চালু থাকলে সর্বত্র একই ঐক্য ও শৃংখলা বিরাজ করবে। অন্য সৃষ্টির জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। কিন্তু মানুষের জ্ঞানকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে আল্লাহ্র প্রেরিত সামাজিক বিধানের আনুগত্য করবে, না তার প্রবৃত্তির পূজা করবে? যদি সে প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করে, তবে সেটাই হবে 'তাওহীদে ইবাদত'। এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই জিন ও ইনসানকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল শয়তান। যে প্রবৃত্তিরূপে এবং সঙ্গী-সাথী ও নেতা রূপে সর্বদা মানুষকে এপথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু জান্নাত পিয়াসী মুমিন সর্বদা এপথে দৃঢ় থাকে। কোন লোভ ও প্রতারণা তাকে আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে এক চুল নড়াতে পারে না। দুনিয়াবী সব ক্ষতি সে হাসিমুখে বরণ করে নেয় কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ প্রেরিত সত্যকেই সে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে। কোন ভয় ও যুক্তিবাদ কিংবা পরিস্থিতির দোহাই তাকে পথচ্যুত করতে পারে না। জান্নাতে ফিরে যাওয়ার উদগ্র বাসনায় সে হয় অসম সাহসী মুজাহিদ। তাইতো দেখা যায় তৎকালীন দুনিয়ার দুর্ধর্ষ শাসক ফেরাঊনের হুমকিতে ভীত হয়নি সদ্য ঈমান আনা জাদুকরগণ। ভীত হয়নি

আছহাবুল উখদূদের সত্তর হাযার ঈমানদার নর-নারী। ভীত হয়নি খাব্বাব, খোবায়েব, বেলাল ও ইয়াসির পরিবার। আজও ভীত হবে না প্রকৃত মুমিন নর-নারী। শয়তানকে পরাভূত করার জন্য মাত্র একটি দর্শনই তাদের মধ্যে কাজ করে। আর তা হ'ল 'তাওহীদ দর্শন'। আল্লাহ্র একত্বের দর্শন। তাঁর বিধানের প্রতি অটুট আনুগত্যের দর্শন। পরকালীন মুক্তি ও চিরস্থায়ী শান্তির দর্শন।

উল্লেখ্য যে, তাওহীদ দর্শনের বিপরীত হ'ল নাস্তিক্যবাদী দর্শন। তাদের ধারণা মতে সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই। সবকিছু আপনা থেকেই চলছে। হঠকারী অন্তর ব্যতীত এদের কাছে কোন যুক্তি নেই। যদি বলা হয়, লেখা আছে লেখক নেই, কথা আছে কথক নেই, এটা কি সম্ভব? তেমনিভাবে সৃষ্টি আছে, অথচ সৃষ্টিকর্তা নেই, সেটা কিভাবে সম্ভব? যদি বলা হয়, মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম? পিতামাতা আগে জন্মেছে না সন্তান? এর কোন জবাব নেই। কেবলি আছে একটা অবিশ্বাসী ও হঠকারী অন্তর।

তাওহীদের বিপরীত আরও তিনটি দর্শন রয়েছে, যা তাওহীদের মুখোশ পরে তাওহীদের ধ্বংস কাজে নিয়োজিত। ১. অসীলা দর্শন ২. অদ্বৈত দর্শন ৩. ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন।

প্রথমটির দাবী মতে কোন মৃত নেককার ব্যক্তির অসীলা ব্যতীত আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা সম্ভব নয়। এজন্য তারা মৃত ব্যক্তির মূর্তি বা কবরে পূজা দেয় ও সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করে। মক্কার মুশরিকরা এটা করত *(যুমার ৩৯/৩)*। দ্বিতীয়টির দাবী মতে সৃষ্টি সবকিছু স্রষ্টার অংশ। স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। যত কল্লা তত আল্লাহ। এরা রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও আল্লাহ্র নূর ভাবে। এরা মুরীদের আত্মা পীরের আত্মায় মিলিত হয়ে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করে এবং তাকে ফানা ফিল্লাহ, বাক্বা বিল্লাহ ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। পূর্বেরটির ন্যায় এটিও স্রেফ শয়তানী খোশ-খেয়াল ব্যতীত কিছুই নয়।

তৃতীয়টির দাবী মতে কেবল ধর্মীয় কিছু অনুষ্ঠানে তারা আল্লাহ্র বিধান মানবে। কিন্তু এর বাইরে মানব জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র বিধান মানবে না। বরং নিজেদের মনগড়া বিধান মেনে চলবে। এটিও পূর্বের দু'টি দর্শনের ন্যায় স্রেফ তাগূতী দর্শন মাত্র।

বস্তুতঃ আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নেয়া, সর্বাবস্থায় সরাসরি তাঁর নিকটে প্রার্থনা করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহ মেনে চলাই হ'ল তাওহীদ দর্শনের মূল কথা। আর এটা মানা ও না মানার মধ্যেই রয়েছে বান্দার পরীক্ষা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

২. ধর্ম দর্শন[২]

বস্তুর স্বভাবগত প্রবণতার দর্শনকেই মূলতঃ 'ধর্মদর্শন' বলা হয়। বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়, পানি সবকিছুকে ভিজিয়ে দেয়, আগুন সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেয়, এগুলিই ওদের ধর্ম। ওরা নীরবে ওদের ধর্ম মেনে চলে, যতক্ষণ না সৃষ্টিকর্তার অন্য কোন হুকুম আসে। যেমন আগুন ইবরাহীমকে পোড়ায়নি, পানি ইউনুসকে ডুবিয়ে মারেনি। বায়ু সুলায়মানকে উল্টে ফেলে দেয়নি। কিন্তু মানুষ? মায়ের গর্ভে চার মাসের ছোট্ট দেহে তার অদৃশ্য রূহটি প্রবেশ করল। ৯ মাস ১০ দিন সেখানে থেকে পুষ্ট হয়ে তিন পর্দার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হ'ল। আস্তে আস্তে বড় হ'ল, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে চিন্তার হাযার গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। জড়বাদী গলি, নাস্তিক্যবাদী গলি, বস্তুবাদী গলি, যুক্তিবাদী গলি, বুদ্ধিবাদী গলি, অদৃষ্টবাদী গলি, মুক্তবুদ্ধি গলি ইত্যাদি। এতগুলি চিন্তার সড়ক ও গলিপথ ঘুরতে ঘুরতে সে এক সময় বুদ্ধিহত হবার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রশ্নের জওয়াব সে খুঁজে পায়না। ওদিকে দৈহিক দিক দিয়ে সে ইতিমধ্যে শৈশব ও যৌবন বেরিয়ে প্রৌঢ়ত্ব শেষ করে বার্ধক্যের কিনারে দাঁড়িয়ে গেছে। কেননা দেহ চলে তার নিজস্ব গতিতে নিজস্ব ধর্মে, তার সৃষ্টিকর্তার বিধান মতে। মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে সে এসেছে পৃথিবীর উদার ভূখণ্ডে। যা বিশ্বলোকের মহাশূন্যে ঝুলন্ত একটি ঘূর্ণায়মান গ্রহ মাত্র। কে সৃষ্টি করল এই সুন্দর পৃথিবীকে। কীভাবে ঝুলে আছে মহাশূন্যে আনুমানিক প্রায় ৬.৬ সেক্সটিলিয়ন টন ওযনের এই বিশাল গ্রহটি, তার বুকে পাহাড়-সাগর, নদী-নালা, মাটি, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী ও কোটি মানুষের বোঝা নিয়ে। চন্দ্র সূর্য উঠছে ডুবছে। বায়ু আপন নিয়মে প্রবাহিত হচ্ছে। সাগর-নদীতে জোয়ার-ভাটা হচ্ছে। ফুল ও ফসলে ভরে উঠছে মাঠ ও গাছ-পালা। মাছে ভরে থাকছে সাগর ও নদী-নালা। সবই চলছে নীরবে আপন গতিতে।

কেবল আমিই রয়েছি বিপদে। কেননা আমার স্বাধীন জ্ঞানশক্তি আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কখনো আমি আস্তিক, কখনো আমি নাস্তিক, কখনো সংশয়বাদী, কখনো দিশেহারা। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি যে, সূচনা ও লয়-এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন সত্তা আছেন। যিনি সবকিছু করছেন দূরদর্শী পরিকল্পনা অনুযায়ী। যিনি স্রষ্টা। তাই সৃষ্টির চর্মচক্ষু তাকে দেখতে পায় না। যে রূহটি বিগত ৬০/৭০ বছর আমার সাথে আমার দেহে বিরাজ করছে, তাকে আজও আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু ওটা যে আছে এবং ওটা যে জীবন্ত, তার প্রমাণ তো আমি নিজে। আমার চলাফেরা, আমার কর্মব্যস্ততা সবই তো

২. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা মে ২০১০।

একটিই কারণে যে, আমার দেহে প্রাণ আছে। যদিও তাকে আমি কখনো দেখিনি। তেমনিভাবে আমার জন্ম, শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, আমার খাদ্য-পানীয়, আমার দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্য, এই পৃথিবী ও বিশ্বলোকের সৃষ্টি ও পরিচালনা সবকিছুর পিছনে একজন অদৃশ্য মহাশক্তিধর সত্তা আছেন, যাঁর হুকুমেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, যার বিধান মতে সবকিছু চলছে এবং যার নির্দেশেই একদিন সবকিছু ধ্বংস হবে। কেননা যার সূচনা আছে, তার শেষ আছে। শেষ হবেন না কেবল তিনি, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা। যার সূচনা নেই, শেষও নেই। যিনি আদি, যিনি অন্ত, যিনি আছেন ও থাকবেন চিরদিন। যিনি চিরঞ্জীব, যিনি সকল শক্তির আধার ও বিশ্ব চরাচরের ধারক।

এখন আমি নিশ্চিত যে আমার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু তাঁর বিধান কোথায় পাব? অন্য সব সৃষ্টি চলছে স্ব স্ব বিধান মতে। কিন্তু আমার চলার পথ কি? সে পথের বিধান কি? আমার সামনে মদ আছে, দুধ আছে। কোন্‌টা খাব। অথচ আমারই গোয়ালের পোষা গরু দিব্যি ঘাস ও শুকনো বিচালী খাচ্ছে ও শক্ত-সমর্থ হচ্ছে। তাকে জোর করলেও পোলাও-বিরানী খাবে না, বিয়ার-হুইস্কি খাবে না বা গাঁজা টানবে না। কিন্তু আমার অবস্থা কী? আমাকে যে জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমি এখন কোন্‌টা খাব? কোন্ পথে চলব? রাস্তা দিয়ে রথ যাচ্ছে। নিজেদের হাতে কাদামাটি দিয়ে গড়া দেবমূর্তি নিয়ে মানুষ চলেছে। সারাদিন পূজা দিয়ে এবার তাকে ডুবিয়ে দেবে। কি হলো এতে? কি পেলাম তাতে? কোন জবাব না পেয়ে কবি গেয়েছেন, রথযাত্রা সমারোহ মহা ধূমধাম, ভক্তেরা সব লুটায়ে শির করিছে প্রণাম। রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি। মূর্তি ভাবে আমিই দেব হাসে অন্তর্যামী'। আমার চিন্তা থমকে গেল। যে সৃষ্টিকর্তা তার অন্য সৃষ্টিকে বিধান দিলেন, তিনি কি তার সেরা সৃষ্টি মানুষকে কোন বিধান দেননি? নিশ্চয়ই তিনি দায়িত্বহীন সৃষ্টিকর্তা নয়। তাইতো দেখছি নবী-রাসূলগণ বলছেন, আমরা আল্লাহ্‌র বার্তাবহ। হে মানুষ! আল্লাহ্‌র বিধান মানো ও আমাদের আনুগত্য কর। তুমি হালাল খাও হারাম খেয়ো না। তুমি দুধ খাও, মদ খেয়ো না'। তাইতো এ যে আমার বিবেকের কথা। মন বলছে মদ খাই, হারাম খাই, কিন্তু বিবেক যে নিষেধ করছে। মন বলছে সূদ খাই, ঘুষ খাই, চুরি করি, মানুষ খুন করি। কিন্তু বিবেক যে ধিক্কার দিয়ে নিষেধ করছে। তাহ'লে তো দেখছি আমার স্বভাবধর্ম নবী-রাসূলগণের অনুগত। তাহ'লে কেন আমি দিশেহারা হয়ে ঘুরছি? আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যুগে যুগে সকল নবী মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার প্রতি আহ্বান জানিয়ে গেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিগত সকল নবীর সত্যায়ন করে গেছেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রেরণ করেছেন। কুরআন ও হাদীছরূপে যা আমার সামনে বিদ্যমান। তাহ'লে কেন আমি দিশেহারার মত এপথে ওপথে দৌড়াচ্ছি?

শেষনবীর রেখে যাওয়া ছিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সরল পথ ছেড়ে কেন আমি অন্য পথে?

সৃষ্টিকর্তাকে পেলাম, তাঁর বিধান পেলাম, এক্ষণে আমার শেষ ঠিকানা কি? যে রূহ এসেছিল একদিন অদৃশ্যলোক থেকে মায়ের গর্ভে, যা এখন আমার দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে আমাকে কর্মতৎপর করে রেখেছে, এ রূহ যখন দেহ পিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, তখন আমার পরিণতি কি হবে? আমার পরিণতি কি এই মাটিতেই শেষ? আমি নিয়ত দেখছি যালেম তার শক্তি ও বুদ্ধির জোরে অসহায় ও দুর্বলের উপর যুলুম করে যাচ্ছে। এরপরেও সে দুনিয়াতে খ্যাতি ও প্রশংসা কুড়াচ্ছে। অন্য দিকে সৎ ও নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মযলূম মার খাচ্ছে ও বদনাম কুড়াচ্ছে। এভাবে যালেম ও মযলূম উভয়ে এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে। অথচ যালেম তার শাস্তি পেল না। মযলূম তার প্রতিদান পেল না। এটাই কি সৃষ্টিকর্তার বিধান? মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

কিন্তু না, নেমে এসেছে আসমানী তারবার্তা। শেষনবীর মুখে ঐ যে শোনা যায় গুরু গম্ভীর ঘোষণা। 'ওরা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?' 'মহা সংবাদ সম্পর্কে?' 'যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে?' 'কখনোই না। শীঘ্র ওরা জানতে পারবে'। 'অতঃপর কখনোই না। শীঘ্র ওরা জানতে পারবে' *(নাবা ৭৮/১-৫)*। হে মানুষ! 'ভয় কর তোমরা সেই দিনকে, যেদিন তোমরা ফিরে আসবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

হ্যাঁ হ্যাঁ এক্ষণে আমি খুঁজে পেয়েছি আমার পথের ঠিকানা। আমি আপনা-আপনি সৃষ্টি হইনি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁরই দাসত্ব করব। তার কাছেই চাইব। তাঁর কাছেই আশ্রয় নেব। তিনি আমাকে পথহারা অবস্থায় ছেড়ে দেননি। যুগে যুগে তিনি পাঠিয়েছেন আসমানী তারবার্তা তাঁর নবীগণের মাধ্যমে। আমি শেষনবী (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া বিধানগ্রন্থ কুরআন ও হাদীছ মানব ও সে পথেই চলব। অতঃপর মৃত্যুর পরে ফিরে যাব সেখানে, যেখান থেকে আমার রূহের সফর শুরু হয়েছিল। সেদিন আমি পাব আমার সৎকর্মের পুরস্কার। যালেম পাবে তার প্রাপ্য শাস্তি, মযলূম পাবে তার ন্যায্য প্রতিদান। হ্যাঁ, আমি এখন শান্ত, আমার জীবন এখন ধন্য। আমি চলব এখন সেই পথে, যে পথে চললে আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাকে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে পুরস্কৃত করবেন। আমি মানব সেই বিধান যা মেনে চললে আমি ইহকাল ও পরকালে হব সম্মানিত ও মর্যাদা মণ্ডিত। আমি আর সংশয়বাদী নই। আমি এখন নিশ্চিন্ত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত- এই তিনটি আলোকস্তম্ভের উপরে আমার

জীবনতরী চলবে। এর বাইরে সবকিছু শয়তানী খোশ-খেয়াল ও মায়া-মরীচিকা ভিন্ন কিছুই নয়।

এটাই হ'ল মানুষের ধর্ম দর্শন। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার চেহারাকে দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ কর। এটাই আল্লাহ্র ফিৎরত বা স্বভাবধর্ম। যার উপরে তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা'। 'সবাই তোমরা তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁকে ভয় কর'... *(রূম ৩০/৩০-৩১)*। পিতা-মাতার কারণে কিংবা ভ্রান্ত পরিবেশের কারণে মানুষ কাফের, মুশরিক, বিদ'আতী হ'তে পারে। কিন্তু সত্য গ্রহণের যোগ্যতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুপ্ত থাকে। যার কারণেই ফেরাঊন মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহকে স্বীকার করেছিল।

অতএব মানুষের কর্তব্য হবে তার স্বভাবধর্মের অনুসারী হওয়া। আর সেটাই হ'ল 'ইসলাম'। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল 'ইসলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। তিনি বলেন, আমি জিন ও ইনসানকে আমার দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। মানব প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ্র প্রতি দাসত্ব ও আনুগত্যের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও মানুষ শয়তানী ধোঁকায় পড়ে সাময়িকভাবে প্রতারিত হয়। আল্লাহ আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন- আমীন!

৩. সত্যদর্শন[৩]

আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার সংঘাত চলে আসছে। মিথ্যার চাকচিক্য এত বেশী যে, স্বয়ং মিথ্যাবাদীও বুঝতে পারে না যে, সে মিথ্যা বলছে। অথচ মিথ্যা সর্বদা মিথ্যাই থাকে। তা কখনোই সত্য হয় না। মানুষ তার সীমিত জ্ঞানে ওটা ধরতে পারে না বলেই পৃথিবীতে মিথ্যা টিকে আছে এবং যুগ যুগ ধরে তা থাকবে ক্বিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত। কেননা মিথ্যার প্ররোচনাদাতা হ'ল শয়তান। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি না করলে এবং ক্বিয়ামত অবধি তার হায়াত দীর্ঘ না করলে মিথ্যার সঙ্গে মানুষের পরিচয়ই হ'ত কি-না সন্দেহ। আল্লাহ এটা করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং সত্য-মিথ্যা বাছাই করে কে সত্যসেবী তা যাচাই করার জন্য। মানুষ যতবড় জ্ঞানীই হৌক সে তার ভবিষ্যৎ জানেনা। এক মিনিট পরে তার জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে, সে বলতে পারে না। পৃথিবীতে বসবাস ও তা পরিচালনার জন্য যাকে যতটুকু জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ তাকে ততটুকু দান করেছেন এবং প্রকৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার নিজ হাতে রেখেছেন।

৩. আত-তাহরীক ১৩ তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০১০।

সীমিত জ্ঞানের মানুষ চিরকাল নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ করেছে স্রেফ আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি শত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও বিজ্ঞান মানুষকে এযাবৎ কেবল 'আংশিক সত্য' (Partial truth) উপহার দিতে পেরেছে, 'পূর্ণ সত্য' (Absolute truth) নয়।

পৃথিবীতে মানব রচিত যত ধর্ম ও মতবাদের জন্ম হয়েছে ও বিলুপ্ত হয়েছে, সবকিছুই ছিল ধারণা ও কল্পনা নির্ভর। স্বল্পজ্ঞানী অধিকাংশ মানুষ সেগুলিকেই অব্যর্থ ধরে নিয়ে তার অন্ধ অনুসরণ করেছে। স্বর্গে পাঠানোর লোভ দেখিয়ে জীবন্ত বিধবাকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাপ-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীরা আনন্দে উলুধ্বনি করেছে মেয়েটি স্বর্গে গেল বলে। যাকে ভারতে 'সতীদাহ' বলা হয়। ধর্মনেতার লালসার খোরাক জোগানোর জন্য 'দেবদাসী' নাম দিয়ে ভক্তিমতি মেয়েদের ইযযত হরণ করাকে পুণ্যের কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ধর্মের নামে। স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী অন্যত্র আর বিবাহ করতে পারবে না বলে ধর্মীয় বিধান রচনা করে অসংখ্য নারীকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে ধর্মের নামে। স্বঘোষিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মার পা থেকে বের হয়েছে বলে তাদের জন্য পৃথক ধর্মীয় বিধান রচনা করা হয়েছে এবং অবমাননাকর রীতি-নীতি তৈরী করা হয়েছে। 'পীরেরা মরেন না'। তারা কবরে জীবিত থাকেন, ভক্তের ডাক শোনেন ও তার ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখেন' এমন ধোঁকা দিয়ে আনন্দে ও বিপদে সর্বাবস্থায় ভক্তের পকেট ছাফ করার কুট-কৌশল অব্যাহত রয়েছে সমাজে ধর্মের নামে। এমনকি বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের ইলেকশন ক্যাম্পেইন শুরু করেন বড় কোন পীর বা রাজনৈতিক নেতার কবরে ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে। ভাবখানা এই যে, কবরবাসীর দো'আ ও আশীর্বাদ নিয়েই শুভ কাজ শুরু করলাম। অথচ কবরবাসী কিছুই শুনতে পান না, জানতে পারেন না। উক্ত কবরবাসী জীবিত অবস্থায় তার নিজের ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখতেন না। লোকেরা সেখানে টাকা দেয় তাকে খুশী করে বিপদে উদ্ধার লাভের আশায় ও তার অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের মিথ্যা ধোঁকায় পড়ে। অথচ ক্ষুধার্ত জীবিত মানুষকে সে খাদ্য দান করে না বা একটু সান্ত্বনাও প্রদান করে না।

ধনী-গরীব বলে কিছুই থাকবে না, সবাই হবে সমান, এমনি এক অবাস্তব মতবাদের ধোঁকায় পড়ে শ্রেণী সংগ্রামের নামে রাশিয়ার বিপ্লবে ১ কোটি ১৭ লক্ষ মানুষকে ও চীনা বিপ্লবে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে মহা উল্লাসে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে। ইহুদী শত্রুরা যে ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার দাবী করল, খৃষ্টান ভক্তরা সেই ঈসাকে উপাস্য বানিয়েই কেবল ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁকে ও তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে নিয়ে তিন উপাস্যের দাবীদার বনে

গেল। তারা আরও বলল, ঈসা তার পূর্বের ও পরের সকল ভক্ত অনুসারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে শূলে বিদ্ধ হয়েছেন। অথচ একজনের পাপের বোঝা অন্যজনে বইবে, এটা কখনোই কোন জ্ঞানী মানুষের কথা হ'তে পারে না। আর সৃষ্টি কখনো সৃষ্টির উপাস্য হ'তে পারে না। অথচ সবই মানুষ সত্য মনে করছে অলীক কল্পনা ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় পড়ে। খৃষ্টপূর্বের প্লেটো সহ বর্তমান ও বিগত যুগের সকল অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, সূদী অর্থব্যবস্থাই হ'ল দারিদ্র্যের প্রধানতম হাতিয়ার। সূদ হটানো ব্যতীত দারিদ্র্য হটানো সম্ভব নয়। অথচ দুষ্টমতি ধনিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতারা সূদ ও ব্যবসায়ের পার্থক্য বুঝতে চান না। জনগণের ভোট নিয়ে জনগণের রক্ত শোষণ করছেন তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে জোঁকের মত সুচতুরভাবে।

বিবাহপূর্ব যৌনমিলন, পায়ুকামিতা, সমকামিতাকে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশটির সুপ্রীম কোর্ট বৈধ বলে রায় দিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে। তাই বলে কি তা বৈধ বলে কারু বিবেকে সায় দিবে? এটাতো স্রেফ পাশবিক স্বাধীনতা! আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ ব্যতীত দলীয় শাসন কখনো নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারে না। জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ববান মানুষ কখনো নেতৃত্ব চেয়ে নেন না, এগুলি স্বতঃসিদ্ধ কথা। অথচ সেগুলিই চলছে অপরিহার্য বিধান রূপে বছরের পর বছর ধরে। তাহ'লে কি সর্বদা এভাবে মিথ্যারই জয়গান চলবে? জণ্ডিসের রোগী সবকিছুকে হলুদ দেখে, তাই বলে পৃথিবী সব হলুদ হয়ে যায় না। সাপে কাটা রোগী তিতাকে মিঠা বলে, তাই বলে তিতা কখনো মিঠা হয় না। অনুরূপভাবে সসীম জ্ঞানের মানুষ অনেক সময় মিথ্যাকে সত্য বলে, সত্যকে মিথ্যা বলে, তাই বলে সত্য কখনো মিথ্যা হয় না এবং মিথ্যা কখনো সত্য হয় না। কারু মতে বিজ্ঞানই সত্য। অথচ কোন বিজ্ঞানীই নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবী করেননি। বরং তারা সকলেই বলেছেন, Science gives us but a partial knowledge of reality 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'। তারা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে থাকেন। তারা বলেন, 'আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখিনা'। যেমন ধোঁয়া দেখে মানুষ আগুনের সন্ধানে ছুটে থাকে।

অতএব সবকিছুর মূলে যিনি সেই মহাসত্যকে খুঁজে পাওয়া ও তাঁর দিকে ধাবিত হওয়ার চিন্তাদর্শনই হ'ল প্রকৃত অর্থে 'সত্যদর্শন'। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সেই সত্যেরই সন্ধান দিয়েছেন। শেষনবীর মাধ্যমে যা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে যা সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর সকল মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও ঐ সত্য চিরকাল সত্যই থাকবে, কখনোই মিথ্যা হবে না। আল্লাহ বলেন, তোমার প্রভুর বাক্য সত্য ও ন্যায় দ্বারা

পূর্ণ। তার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। ‘যদি তুমি অধিকাংশ লোকের কথামত চলো, তাহ’লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। কেননা ওরা ধারণার অনুসরণ করে এবং ওরা অনুমানভিত্তিক কথা বলে’ *(আন‘আম ৬/১১৬-১৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি (সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে) দিশেহারা হয়ে থাকবে, যেমন ইহুদী-নাছারারা হয়েছে? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এসেছি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে। যদি আজ মূসাও বেঁচে থাকতেন, তাহ’লে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তার কোন গত্যন্তর থাকতো না’ *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৭)*। অতএব আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ‘অহি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হ’ল প্রকৃত অর্থে ‘সত্যদর্শন’। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

৪. সমাজ দর্শন[৪]

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দর্শনই হ’ল ‘সমাজ দর্শন’। মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব। সমাজ চেতনা তার মধ্যে জন্মগত। আদম ও হাওয়া দু’জনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা। অতঃপর তাদের বংশধরগণের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে মানুষের আবাদ হয়। নূহের প্লাবনে নৌকায় উঠে বেঁচে যাওয়া মুষ্টিমেয় ঈমানদার মানুষের বংশধর আজকের পৃথিবীর সকল মানুষ। কেবল মানুষই নয়, আজকের গবাদিপশুও সেদিনের নূহের নৌকার সওয়ারী ভাগ্যবান গবাদিপশুগুলির বংশধর।

মানুষ ও পশু-পক্ষী সবাই সমাজ চেতনা সম্পন্ন। সবারই প্রথম ইউনিট একজোড়া নর ও মাদী। অতঃপর পরিবার, অতঃপর গোত্র, অতঃপর বৃহত্তর সমাজ। কিন্তু মানুষ ও পশু-পক্ষীর সমাজ চেতনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের মধ্যে জৈবিক চেতনার সাথে সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত থাকে। ফলে তার সমাজ জীবনের বন্ধন হয় দৃঢ় ও দ্যোতনাময় এবং সর্বব্যাপী। অবশেষে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু পশু-পক্ষীর চেতনা হয় স্রেফ জৈবিক ও রৈপিক। যার স্থায়িত্ব হয় সাময়িক। সেখানে কোন নৈতিক চেতনা থাকে না। কিন্তু আত্মরক্ষার স্বার্থে তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য চেতনা কাজ করে। সেজন্য প্রত্যেক পশু-পক্ষী স্ব স্ব জাতি ও গোত্রের সাথে বাস করে। হরিণ হরিণের সাথে, বাঘ বাঘের সাথে, মাছ মাছের সাথে, গরু-ছাগল, উট, ঘোড়া, ভেড়া সবাই স্ব স্ব গোত্রের সাথে বসবাস করে। পাখি আকাশে ওড়ে সুশৃংখলভাবে একজন নেতাকে সামনে রেখে। পিঁপড়া মাটিতে চলে সুবিন্যস্ত ধারায় তাদের একজন নেতাকে সামনে রেখে। মৌমাছি

৪. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০০৯।

মধু সঞ্চয় করে তাদের রাণী মাছিকে ঘিরে। একটা মৌমাছি, বোলতা বা ভিমরুলকে কেউ আঘাত করলে হাযারটা এসে শত্রুকে দংশন করে। এভাবে সর্বত্র রয়েছে এক ধরনের সমাজ চেতনা। মানুষ হ'ল সৃষ্টিকুলের সেরা। তাই মানুষের মধ্যে সমাজ চেতনা সর্বাধিক এবং মানুষের বাঁচার জন্য ও পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনও সবচাইতে বেশী।

আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজোড়া পুরুষ ও নারী থেকে এবং আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল বিষয়ে জ্ঞাত এবং গোপন বিষয়ে অবগত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। অত্র আয়াতে মানুষের মৌলিক সমাজ দর্শন বিধৃত হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমেই দু'জন নারী-পুরুষের মাধ্যমে মানব সমাজের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। বানর-হনুমান দ্বারা নয়। অতঃপর আদমের সন্তানাদি ও বংশধরগণের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবার, গোত্র ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পরিবার ও বংশধরগণকে সমাজবদ্ধ রাখার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন নামে পরিচিত করা হয়েছে। এখানে পরিচিতিই মুখ্য। বংশীয় অহংকার ও আভিজাত্যের বড়াই মুখ্য নয়। কেননা সবাই এক আদমের সন্তান। অতঃপর সমমনা মানুষের সমবায়ে এক একটি সংগঠন সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে মানুষ তার ইচ্ছার প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন ঘটায় এবং আগ্রাসী মানুষদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(আত্মার জগতে) রূহসমূহ সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনীর ন্যায় ছিল। অতঃপর (দুনিয়াতে এসে) তারা (সেদিনের) সমমনাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং অন্যদের সাথে মতভেদ করে *(বুখারী হা/৩৩৩৬)*। এ পর্যায়ে বিপরীতমুখী চেতনার কারণে মানুষের মধ্যে দ্বিমুখী ধারার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ দু'ধরনের (১) সৎ আল্লাহভীরু (بر تقىّ) এবং (২) অসভ্য হতভাগা (فاجر شقىّ) *(তিরমিযী হা/৩৯৫৫)*। দু'ধারার সংঘাতে অনেক সময় অসভ্য দুর্ধর্ষরা বিজয়ী হলেও আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীলগণ সর্বদা নৈতিকভাবে বিজয়ী হয়ে থাকেন। পৃথিবী চিরদিন তাদেরকেই স্মরণ করে ও তাদেরকেই অনুসরণ করে। এঁরাই হ'লেন মানুষের মধ্যে সেরা ও সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহভীরু সৎব্যক্তি ও অসভ্য অসৎব্যক্তি উভয়ে একই মানব সমাজের অংশ। কিন্তু নৈতিক চেতনার পার্থক্যের কারণে উভয়ের মর্যাদা ভিন্ন হয়েছে। আমরা যদি মানব জাতিকে একটি ফলবান বৃক্ষের সাথে তুলনা করি, তাহ'লে বলা যাবে যে, কেউ উক্ত বৃক্ষের গুঁড়ি,

কেউ শাখা, কেউ কাঁটা, কেউ ছাল, কেউ পাতা, কেউ ফুল, কেউ ফল ইত্যাদি। সবাই একই বৃক্ষমূলের অংশ। কারু উপরে কারু প্রাধান্য নেই, কেবল বিশেষ গুণ ব্যতীত, যা তাকে অন্যের থেকে পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করে। ফলে যারা আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল, তারা ঐ মানববৃক্ষের ফুল ও ফল হিসাবে বরিত হন। দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই সম্মানিত ও মর্যাদামণ্ডিত। আর দুষ্টগুলো হয় কাঁটার মত। ওদেরকে মাড়িয়েই গোলাপ আহরণ করতে হয়। এজন্যই সৃষ্টি হয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, সংগঠন ও ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্র। যা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকে।

সৎ হৌক আর অসৎ হৌক একটি মৌলিক দর্শনে সকলে এক। আর তা হ'ল সমাজ ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না। যেমন পানি ব্যতীত মাছ বাঁচতে পারে না। মানুষ প্রতি পদে পদে সমাজের মুখাপেক্ষী। এমনকি এক প্লেট ভাত খেতে গেলেও তার প্রয়োজন হয় বহু লোকের সহযোগিতা। চাউলের জন্য ধান উৎপাদন। সেজন্য ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন ও ধান হওয়া পর্যন্ত জমির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ, অতঃপর মাঠ থেকে বাড়ীতে এনে ধান মাড়াই, অতঃপর তা সিদ্ধ করা, শুকানো ও চাউল করা, অতঃপর বাজারে আনা, অতঃপর তা খরিদ করে বাড়ীতে আনা। অতঃপর পানি ও আগুনের সাহায্যে রান্না করা, এরপর তা প্লেটে আনা। এতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে আসতে প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষকে সাহায্য নিতে হয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অন্য মানুষের। আর আল্লাহ সবধরনের রুচি ও ক্ষমতার মানুষ এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, যাতে একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। এভাবেই মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরস্পরে একটি সমাজগ্রন্থীতে পরিণত হয়। পুরা সমাজ দেহ উক্ত গ্রন্থীতে আবদ্ধ থাকে। কেউ নিঃসঙ্গ হ'তে চাইলে তা হয় সাময়িক বিশ্রামের মত। সেখানেও সে একাকী থাকতে পারে না, যদি না অপরের সাহায্য পায়। এই নিঃসঙ্গতা হয় সাধারণত দু'টি কারণে। (১) অন্যের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপনের নিঃসঙ্গতা (২) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট নিজেকে সঁপে দেবার জন্য ইবাদতে নিঃসঙ্গতা। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে অপরের সাহায্য নিতে হয় এবং অবশেষে তাকে ফিরে আসতে হয় আনন্দ ও বেদনায় কোলাহল মুখর মানব সমাজে। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে মুসলমান মানুষের সঙ্গে মেশে ও তাদের দেওয়া কষ্টে ছবর করে, ঐ ব্যক্তি উত্তম সেই ব্যক্তির চাইতে, যে তাদের সঙ্গে মেশে না ও তাদের দেওয়া কষ্টে ছবর করে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৭)*।

এক্ষণে মানব সমাজের মৌলিক দর্শন হ'ল, সে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী একটি সামাজিক জীব। সে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাকে বিশেষ গুণাবলী দিয়ে তাঁর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সে সর্বদা সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপনের

মুখাপেক্ষী ও এর প্রতি আগ্রহী। সে একটি দূরদর্শী বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে চায় এবং সর্বদা একজন যোগ্য নেতা ও ক্ষমতাবান শাসকের অধীনে সুস্থ জীবন যাপন করতে চায়। আর এজন্যেই পৃথিবীর প্রথম মানুষকে আল্লাহ প্রথম নবী করে পাঠিয়েছেন। যার নেতৃত্বে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী তখনকার মানুষ পরিচালিত হ'ত। যুগে যুগে এভাবে শেষনবীর আগমন পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন ও মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে গেছেন। কিন্তু শয়তানের তাবেদার দুষ্ট লোকেরা চিরকাল নবীদের বিরোধিতা করে গেছে এবং মানব সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। সমাজে নবীগণের অনুসারী ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে সংঘাত সর্বদা ছিল ও থাকবে। এভাবেই যাচাই হবে কে এ পার্থিব জীবনে সুন্দরতম আমলকারী হবে এবং যার বিনিময়ে সে পরকালে জান্নাতের অধিকারী হবে।

মানুষের মন চায় শয়তানের তাবেদারী করতে, আর বিবেক চায় আল্লাহ্র আনুগত্য করতে। মন আর বিবেকের সংঘাত চিরন্তন। কিন্তু কেউই জানেনা তার ভবিষ্যৎ শান্তি ও কল্যাণ কিসে নিহিত। এজন্য মানুষ সর্বদা 'শাশ্বত সত্যে'র মুখাপেক্ষী থাকে। সেটাই আল্লাহ পাঠিয়ে দেন নবীগণের মাধ্যমে। শান্তিকামী মানুষ তা গ্রহণ করে ধন্য হয়। কিন্তু শয়তানের তাবেদাররা সর্বদা তাতে বাধা সৃষ্টি করে ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে। আখেরী যামানায় আখেরী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত হ'ল 'ইসলাম'। যা সংকলিত আকারে মওজুদ রয়েছে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে। মানুষ যদি সত্যিকারের মানবিক দর্শন অনুযায়ী চলতে চায় এবং সমাজ দর্শনের মূল দাবী অনুযায়ী সুস্থ সমাজ জীবনের অধিকারী হ'তে চায়, তাহ'লে তাকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহাসত্যকে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরতে হবে। যুগে যুগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সে উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে। ঐ দুই সত্যকে এড়িয়ে অন্য কোন দর্শন দিয়ে পরিচালিত হ'লে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে নেমে আসবে কেবলি ব্যর্থতার অমানিশা।

প্রশ্ন হ'ল, রহমানী ও শয়তানী দ্বিমুখী চেতনার সংঘাতে মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক রক্ষার দর্শন কি হবে? জবাব এই যে, মানুষ হিসাবে সকলের প্রতি সাধারণ মানবিক শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। সকলের সাথে স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। মানুষের মধ্যেকার সুপ্ত ইলাহী চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এজন্য সর্বদা হাব্লুল্লাহকে (অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিরোধ করবে। সমমনা ঈমানদারগণের সাথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় সাংগঠনিক ঐক্য গড়ে

তুলবে। কিন্তু কোন অবস্থায় মিথ্যা ও আল্লাহ বিরোধী তৎপরতাকে সমর্থন করা যাবে না বা তার সাথে আপোষ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তাঁর বিপদগ্রস্ত নবীকে বলেন, 'তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট' *(আনফাল ৮/৬৪)*। আল্লাহ্র এ বাণীর মধ্যে একটি শাশ্বত সমাজ দর্শনের পথনির্দেশ পাওয়া যায়। তাহ'ল এই যে, সত্যনিষ্ঠ মানুষ কোন অবস্থায় মিথ্যার সাথে আপোষ করবে না। আল্লাহভীরু মানুষ কখনোই শয়তানকে ভয় পাবে না ও তার প্রলোভন ও প্রতারণায় আদর্শচ্যুত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'শয়তানের কৌশল সর্বদাই দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*। অতএব আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থেকে সকলের সাথে মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলাই হবে মুমিনের জন্য মৌলিক সমাজ দর্শন। আল্লাহ আমাদেরকে ইলাহী সমাজদর্শনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলী যুগের গোত্রীয় সংকীর্ণতা ও বাপ-দাদার অহমিকা দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দুই ধরনের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম হ'ল মাটির তৈরী' (আবুদাঊদ হা/৫১১৬)।

৫. মানবাধিকার দর্শন[৫]

প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত মৌলিক অধিকারকেই মানবাধিকার বলা হয়। যেমন জান-মাল-ইযযত, খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সর্বোপরি স্বাধীন ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। মানবাধিকার সর্বদা পরস্পর সম্পর্কিত। তা কখনোই এককভাবে অর্জিত হয় না। আর এ কারণেই মানুষ সর্বদা সমাজবদ্ধ থাকতে বাধ্য এবং একইভাবে সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরের অধিকার অর্জনে ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করতে বাধ্য। মানুষ পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত বেশী যত্নবান হবে, সমাজে তত বেশী শান্তি ও উন্নতি নিশ্চিত হবে। এর বিপরীত হ'লে সমাজে অশান্তি ও অধঃপতন ত্বরান্বিত হবে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, মানবাধিকার অক্ষুণ্ন রাখার উপায় কি? জবাব এই যে, ব্যক্তি এমন কাজ করবে না যা সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে সমাজ এমন কাজ করবে না, যা ব্যক্তির সম্মান ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে। এখন প্রশ্ন হ'ল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উপায় কি? এর জবাব দু'ভাবে পাওয়া যায়। ১. মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জবাব ২. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত জবাব। আল্লাহ্র বিধান যেহেতু

৫. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০১০।

সবার জন্য সমান, তাই স্বেচ্ছাচারী লোকেরা তা অস্বীকার করে কিংবা এড়িয়ে চলে। ফলে সুবিধাবাদী মানুষ নিজের মনমত জবাব তৈরী করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। কারণ মানুষ নিজেই নিজের পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। সে কে? তার মর্যাদা কি? তার অধিকার কি? সঠিকভাবে সে কিছুই বলতে পারে না। কেউ বলেন, সে একটি সামাজিক জীব। কেউ বলেন, অর্থনৈতিক জীব। কেউ বলেন, সে একটি যৌন প্রাণী। কেউ বলেন, সে আসলে মানুষই নয়, বরং বানরের বংশধর। এক্ষণে যদি মানুষ তার নিজের পরিচয়ই না জানে, তাহ'লে তার অধিকার সে কিভাবে নির্ণয় করবে? বিগত যুগে শক্তিশালী গোত্র ও সমাজনেতারা যেভাবে নিজেরা কিছু বিধান রচনা করে নিজেদের স্বার্থ পাকাপোক্ত করে নিত, এ যুগেও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্ন পথ বাৎলিয়েছেন। যা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যুগে যুগে হাযারো মানুষের জীবন গিয়েছে। কিন্তু মানুষ কোনটাতে স্থির থাকেনি। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জীবন নদীর এ তীরে ধাক্কা খেয়ে মানুষ অনেক আশা নিয়ে অপর তীরে গিয়েছে। কিন্তু আশাহত হয়ে পুনরায় ফিরে মাঝনদীতে হাবুডুবু খেয়েছে। বর্তমানে যার জগাখিচুড়ী দার্শনিক নাম দেওয়া হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। যা থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথেসিসের সমন্বিত নাম। চমৎকার এই আকর্ষণীয় মোড়কের মধ্যে রয়েছে কেবল বিংশ শতাব্দীর কয়েক কোটি নিহত বনু আদমের শুকনো রক্তের গুড়া পাউডার। অতঃপর বর্তমানে বিভিন্ন ইযম ও তন্ত্র-মন্ত্রের নামে মানবাধিকার রক্ষার ধুয়া তুলে নিজ দেশের নিরীহ জনগণের মানবাধিকার প্রতিনিয়ত হরণ করা হচ্ছে। সাথে সাথে অন্য দেশের মাটি ও মানুষের উপর অবিশ্রান্ত ধারায় গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করে ও মনুষ্যবিহীন ড্রোন বিমানের হামলা চালিয়ে বিরামহীনভাবে রক্ত ঝরিয়ে কিংবা নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ভাটির দেশকে পানিশূন্য করে অথবা কূটনৈতিক প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষের মৌলিক অধিকার হরহামেশা লুণ্ঠন করা হচ্ছে। সেই সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অর্থে পুষ্ট শত শত মিডিয়া অহরহ ঐসব রক্ত পিপাসুদের বন্দনায় মুখর হচ্ছে। ফলে মানবতা ও মানবাধিকার নীরবে নিভৃতে গুমরে মরছে।

২- অতঃপর মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণে এলাহী জবাব এই যে, মানুষ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকুলের সেরা ও জ্ঞানসম্পন্ন একক প্রাণী। আকাশ, পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু সে নিজে আল্লাহ্র কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ্র দাসত্বে সকল মানুষ স্বাধীন। আল্লাহ্র বিধানের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। এখানে উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, কিংবা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আইনগত কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি তথা তাওহীদ বিশ্বাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক সমানাধিকার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি আল্লাহ্র বিধান সমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার আইনগত

সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস বেলাল নিমেষে সকলের ভাই হয়ে গেলেন। এমনকি তার মর্যাদা বেড়ে এতদূর পৌঁছল যে, কা'বা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার ও পরবর্তীতে মদীনার মসজিদে নববীর স্থায়ী মুওয়াযযিন হওয়ার শ্রেষ্ঠতম গৌরবের অধিকারী হলেন। খেলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠানের ভাষণে আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট অধিক শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকটে অধিক দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার থেকে দুর্বলের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারি'। মৃত্যুকালে কপর্দকহীন আবুবকর নিজের কাফনের জন্য কন্যা আয়েশাকে বললেন, আমার পরনের কাপড় দিয়ে আমার কাফনের ব্যবস্থা করো। কেননা জীবিত ব্যক্তিরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার'। খেলাফতে রাশেদাহ্র ছত্রে ছত্রে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালে খেলাফতের ক্ষয়িষ্ণু আমলেও এমন বহু নযীর রয়েছে, আধুনিক বিশ্ব যা কল্পনাও করতে পারে না।

প্রশ্ন হ'ল, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার এই অভূতপূর্ব প্রেরণার মূল উৎস কি? জওয়াব একটাই। আর সেটা হ'ল, তার বিশ্বাসের পরিবর্তন। আগে সে নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস মনে করত। এখন সে আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আগে সে নিজের রচিত বিধানকে চূড়ান্ত ভাবত। এখন সে আল্লাহ্র বিধানকে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করে। আগে সে দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করত। এখন সে আখেরাতকে সবকিছু মনে করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতে মুক্তি লাভের উদগ্র বাসনা তাকে অন্যের অধিকার রক্ষায় সচেতন ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যুদ্ধের ময়দানে আহত মৃত্যুপথযাত্রী তৃষ্ণার্ত সৈনিক কাতরকণ্ঠে 'পানি' 'পানি' বলে কাতরাচ্ছে। পানি আনা হ'লে একই শব্দ ভেসে এল তার কানে। তাই নিজে না খেয়ে ইঙ্গিত করলেন, ঐ ওকে দাও। সেখানে গেলে পাশ থেকে একই শব্দ ভেসে এল। তখন তিনি না খেয়ে ইঙ্গিত করলেন, ঐ ওকে দাও। সেখানে গেলে দেখা গেল তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আখেরাতে পাড়ি জমিয়েছেন। দ্রুত ফিরে এসে দ্বিতীয় জন অতঃপর প্রথম জন কাউকে আর জীবিত পাওয়া গেল না। পানি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক সাক্ষী! এ দৃশ্য কি পৃথিবী অন্য কারো কাছে দেখেছে?

কেবল মানবাধিকার নয়, একটা নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুরের তৃষ্ণা মেটানোর অধিকার রক্ষার জন্য মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে একজন মহিলা মরুভূমির গভীর কূয়ায় নেমে নিজের চামড়ার মোযা ভরে পানি এনে তাকে খাইয়ে বাঁচালেন। এ অভাবনীয় দৃশ্যও মানুষ দেখেছে। একটাই দর্শন সেখানে কাজ করেছে। আর তা হ'ল তাওহীদ,

রিসালাত ও আখেরাতের দর্শন। সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দুনিয়াকে সুন্দরভাবে আবাদ করে আখেরাতে মুক্তির জন্য। সে দুনিয়াপূজারী নয়, আখেরাতই তার লক্ষ্য। উক্ত দর্শন দৃঢ়ভাবে ধারণ ও তা যথার্থভাবে বাস্তবায়ন ব্যতীত মানবাধিকার রক্ষার সত্যিকারের কোন উপায় আছে কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৬. সার্বভৌমত্ব দর্শন[৬]

টেরিটরি, পপুলেশন, গভর্ণমেন্ট ও সভারেন্টি তথা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব-এই চারটি স্তম্ভ মিলে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এর মধ্যে সার্বভৌমত্বের স্থান সবার উপরে। যা না থাকলে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও সরকার ছিল। কিন্তু সার্বভৌমত্ব ছিল না বিধায় তা কোন রাষ্ট্র বলে অভিহিত হ'ত না। এক্ষণে সার্বভৌমত্ব বলতে সেই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে বুঝায়, যাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। রাষ্ট্রের ভিতরে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে ক্ষমতা মেনে চলে এবং না মানলে দণ্ডনীয় হয়। যে শক্তি বিদেশের কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, সেটাই হ'ল সার্বভৌম শক্তি। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাইরে প্রযোজ্য হয় না। কেননা তাতে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লংঘিত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা হ'ল সর্বব্যাপক, স্থায়ী, অবিভাজ্য, হস্তান্তরের অযোগ্য, মৌলিক, চরম ও সীমাহীন। দেহের মধ্যে আত্মা যেমন সকল শক্তির উৎস। অথচ তাকে দেখা যায় না। সেটি কোথায় থাকে তাও বলা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায়। অমনিভাবে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের কোথায় থাকে, সরকারের মধ্যে, না জাতীয় সংসদের মধ্যে, না নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে, না জনগণের মধ্যে, তা ঠিক করে বলা যায় না। অথচ এটা হারিয়ে গেলেই রাতারাতি সবকিছু পরাধীন হয়ে যায়। প্রাণের ব্যবহারকারী যেমন দেহ, তেমনি সার্বভৌমত্বের ব্যবহারকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হ'ল সরকার। বিগত যুগে শক্তিশালী গোত্রনেতা, রাজা ও সম্রাটগণ এই ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। বর্তমান যুগে তা ব্যবহার করেন জনগণের নির্বাচিত সরকার। সেকারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি বলেছেন, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই হ'ল সার্বভৌমিকতা'। রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলতে এখানে জনগণের ইচ্ছাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা রাষ্ট্র কোন প্রাণী নয় এবং তার কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। আর এ কারণেই

৬. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০১০।

এযুগে বলা হয়ে থাকে যে, 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' এবং 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হ'তে এযাবত বিতর্ক চলছে, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য, না ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য। অধ্যাপক ল্যাস্কি, মেটল্যান্ড, গিয়ার্কে, বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নয়। এটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যান্য সংঘ ও সমিতির মধ্যে অবস্থিত। এ মতের অনুসারীদের অনেকে এমনও মত প্রকাশ করেছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার তিরোধান হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে, বিচার বিভাগ সার্বভৌম না জাতীয় সংসদ সার্বভৌম? রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের সঠিক দর্শন ও প্রকৃত ক্ষমতা কি- এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিগত পাঁচশ' বছরে একমত হ'তে পারেননি। যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জ্ঞানী মানুষগুলির অবস্থা এই, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন? তাদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা অর্থ তাদেরকে স্রেফ স্বেচ্ছাচারী করে তোলা। অথচ কে না জানে যে, স্বেচ্ছাচারী মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে ভয়ংকর। বাস্তবিক পক্ষে এসব বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি এবং হবেও না। কেননা মানুষ চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান জানেনা এবং তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের সঠিক খবর রাখে না।

বস্তুতঃ গোত্র, সমাজ, সংস্থা, সংগঠন, রাষ্ট্র ইত্যাদি মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তোলে মানবতার সুরক্ষার জন্য ও মানবীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। আর এজন্যেই রাষ্ট্রকে মানুষ দিয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারকারীগণ যদি মানবতার সুরক্ষা না করে মানবতাকে ধ্বংসের কাজে ব্রতী হয়, তাহ'লে ঐ ক্ষমতা অবশ্যই তিরোহিত হওয়া কাম্য হবে। সেযুগের ইরাকে নমরূদের চারশ' বছরের রাজত্বকালে যত মানুষ নিহত ও নিগৃহীত হয়েছে, এযুগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এক দিনেই এক নিমেষে তার চেয়ে নিঃসন্দেহে বহুগুণ বেশী মানুষ নিহত ও পঙ্গু হয়েছে এবং আজও পৃথিবীব্যাপী এইরূপ ধ্বংসকারিতা চলছে। সবকিছুই করা হচ্ছে জনগণের নামে ও জনগণের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে। ভাবখানা এই, যারা মরছে ও নির্যাতিত হচ্ছে, ওরা জনগণ নয়, বরং যারা মারছে ও নির্যাতন করছে, ওরাই কেবল জনগণ। শাসকদের এই সন্ত্রাসী চরিত্রের কারণ হ'ল এই যে, তাদের কাছে মানবীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। জানা নেই সার্বভৌমত্বের দর্শন কী?

সার্বভৌমত্বের মৌলিক দর্শন হ'ল, সর্বোচ্চ সত্তার সীমাহীন ক্ষমতার অধীনে মাটি ও মানবতা নিরাপদ থাকা। প্রশ্ন হ'ল, মানুষ কি কখনো সর্বোচ্চ সত্তা হ'তে পারে? মানুষের কি সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে? মানুষের অধীনে কি মাটি ও মানবতা নিরাপদ থাকে? যদিও সবখানে মানুষই থাকবে। মানুষই রাষ্ট্রপ্রধান হবে, মানুষই রাষ্ট্র চালাবে, মানুষই মাটি ও মানবতা রক্ষা করবে। কিন্তু যখন তার দর্শন হবে এই যে, সবার উপরে আমিই সত্য, আমার উপরে নাই- তখনই ঐ মানুষটি হবে একটা হিংস্র পশু। পক্ষান্তরে যখন ঐ মানুষটির দর্শন হবে এই যে, আমি এক মহান সত্তা দ্বারা সৃষ্ট এবং আমি তার গোলাম। তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান সমূহ বাস্তবায়ন করাই আমার দায়িত্ব, আমাকে সকল কর্মের হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে এবং তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে, তখন ঐ মানুষটিই হবে মাটি ও মানবতার প্রকৃত রক্ষক। সে হবে মানুষের পাহারাদার ও দিন-রাতের সেবক। তখনি রাষ্ট্র হবে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন। তখন আল্লাহ ছাড়া সে কাউকে ভয় করবে না।

কুরআনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার বলা হয়েছে। (১) আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস (২) আল্লাহ প্রেরিত বিধান সমূহ চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ এবং তা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় (৩) অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির অনুসারী এবং সংখ্যা কখনো সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড নয়'। প্রশ্ন হ'ল, অধিকাংশ লোকের সমর্থন ছাড়া তো আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে না। জবাব এই যে, এ বিষয়ের উপরেই জনগণের মতামত নিতে হবে যে, তারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব চায়, না মানুষের সার্বভৌমত্ব চায়। তারা আল্লাহ্র বিধান মতে শাসিত হ'তে চায়, না স্বেচ্ছাচারী কিছু মানুষের দ্বারা শাসিত ও নির্যাতিত হ'তে চায়? যতদিন দেশের মানুষের স্পষ্ট মতামত এ ব্যাপারে না পাওয়া যাবে, ততদিন কেবল দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের জন্য কোনরূপ চরমপন্থা অবলম্বন করা যাবে না। কিংবা নির্বাচনের নামে কোনরূপ প্রলোভন, ভয় প্রদর্শন ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। মানুষকে প্রথমে দু'টি সার্বভৌমত্বের পার্থক্য বুঝাতে হবে। অতঃপর স্বাধীনভাবে তাকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। যখন তারা বুঝে-সুঝে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে কবুল করবে, তখনই কেবল ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে এবং মানুষ আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে। বস্তুতঃ এলাহী সার্বভৌমত্বের দর্শন হ'ল, নির্যাতিত মানবতার সত্যিকারের মুক্তির দর্শন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৭. স্বাধীনতা দর্শন[৭]

মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে। সে স্বাধীনভাবেই হাসে-কাঁদে ও চলাফেরা করে। যার যা স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেন, সে সেই স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা নিয়েই চলে। কিন্তু যখন সে বড় হয় এবং তার কথা ও কর্ম সমাজে প্রভাব ফেলে, তখন স্বভাবতই তার সবকিছুতে একটা নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। সে আর মুক্ত বিহঙ্গের মত চলতে পারে না। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ তাকে মার্জিত করে ও সমাজে তাকে সম্মানিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হ'লেই সে হয় স্বেচ্ছাচারী এবং সমাজে হয় অসম্মানিত। ফলে শৈশবের স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণযোগ্য ও উপভোগ্য হ'লেও পরিণত বয়সে তা হয় অগ্রহণযোগ্য। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য। স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার পার্থক্য এখানেই।

মানুষের এই স্বাধীনতা তার চিন্তা ও চেতনায়, কথায় ও কর্মে, পরিবারে ও সমাজে এবং পৃথিবীর সর্বত্র। যুগে যুগে মানুষের উক্ত স্বাধীন চেতনা যখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তখনই সে ফুঁসে উঠেছে। এটা যখন ব্যাপক রূপ নিয়েছে, তখনই রাষ্ট্র বিভক্ত হয়েছে। উপমহাদেশ সহ পৃথিবীতে যেখানেই মুক্তি সংগ্রাম হয়েছে, সব জায়গায় চেতনা ছিল একটাই- যুলুম থেকে বাঁচা এবং নিজেদের জান-মাল ও ইযযতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। স্বাধীনতার মূল দর্শন এখানেই। এই দর্শন কি বাস্তবতার মুখ দেখেছে? যাদের চেষ্টায় ও যাদের রক্তে এদেশ দু'বার স্বাধীন হয়েছে, তাদের সে স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে? নাকি নৈরাশ্যের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

মানব জাতির এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে শেষনবী (ছাঃ) এসেছিলেন মক্কায়। সকলকে তিনি দাওয়াত দিলেন আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি। দাওয়াত দিলেন অহি-র বিধানের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের। দেখা দিল প্রতিক্রিয়া। অপবাদ ও নির্যাতন শুরু হয়ে গেল তাঁর ও তাঁর সাথীদের উপর। নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরিত একদিন এসে কা'বা চত্বরে শায়িত চিন্তান্বিত রাসূলকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করবেন না? তখন রাগান্বিত রাসূল উঠে বসে বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের গর্তের মধ্যে ফেলে মাথা থেকে পুরা দেহ করাতে চিরে দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তবুও তাদেরকে

৭. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০১০।

তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কাউকে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে দেহের হাড্ডি থেকে গোশত ও শিরা ছাড়িয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। তবুও তারা তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়নি। মনে রেখ আল্লাহ্র এই শাসন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে এবং এমন (নিরাপদ) অবস্থা আসবে যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ থেকে হাযারা মাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। কিন্তু কাউকে ভয় করবে না কেবল আল্লাহকে ব্যতীত এবং তার মেষপালের উপর নেকড়ের হামলার ভয় ব্যতীত' *(বুখারী, মিশকাত, হা/৫৮৫৮)*। এই কথা যখন রাসূল (ছাঃ) বলছেন, তখন তিনি ছিলেন মক্কায় শত্রুবেষ্টিত। তিনি ও তাঁর সাথীরা সেখানে ছিলেন সর্বদা নির্যাতিত। অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকল। সকলে একে একে মক্কা ছেড়ে হাবশা ও ইয়াছরিবে হিজরত করল। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)ও হিজরত করলেন ইয়াছরিবে। এক্ষণে ইয়াছরিব হ'ল 'মদীনা'। মক্কার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেকটা শান্তি এখানে। কিন্তু না। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হ'ল ইহুদী ও মুনাফিকদের অপতৎপরতা। আবার অস্ত্রের ঝনঝনানি। পুনরায় অশান্তি ও সেই সাথে অন্নকষ্ট। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে রাসূল! কতদিন আমাদেরকে এই ভীতি ও অন্নকষ্টে কাটাতে হবে! জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) সেখানে উপবিষ্ট আদী ইবনু হাতেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, অবস্থা এমন শান্তি ময় হবে, যখন (ইরাকের) 'হীরা' নগরী থেকে একজন পর্দানশীন গৃহবধু একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় যাবে ও বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে আসবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় পাবে না। যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, কিসরার ধনভাণ্ডার বিজিত হবে। যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, মানুষ ঘর থেকে মুঠো ভর্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে বের হবে, কিন্তু নেওয়ার মত কোন প্রার্থী খুঁজে পাবে না। রাবী 'আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন, পর্দানশীন কুলবধুকে আমি একাকী 'হীরা' থেকে মক্কায় ভ্রমণ করতে দেখেছি, কিসরার ধনভাণ্ডার বিজয়ে আমি নিজে অংশ নিয়েছি। এক্ষণে যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তোমরা অবশ্যই সেটা দেখবে, যা আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তোমরা মুঠোভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে, অথচ প্রার্থী খুঁজে পাবে না' (অর্থাৎ দারিদ্র্য থাকবে না)। *(বুখারী, মিশকাত, হা/৫৮৫৭)*।

বেশী দিন লাগেনি। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র এক যুগের মধ্যেই ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এত বেশী অর্থ জমা

হয়েছিল যে, তিনি ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র গরীবদের তালিকা করে তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ভাতা পৌঁছাতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে বায়তুলমালে কোন অর্থ আমি সঞ্চিত রাখব না। সবাইকে এমনকি ছান‘আর পাহাড়ে অবস্থানকারী মেষপালককেও আমি তার ঘরে রাষ্ট্রীয় ভাতা পৌঁছে দেব' *(কিতাবুল খারাজ ইত্যাদি)*। ওমর (রাঃ) জুম‘আর খুৎবা দিতে মিম্বরে বসেছেন। জনৈক মুছল্লী বললেন, বায়তুল মাল থেকে সবার ভাগে যে কাপড় বণ্টিত হয়েছে, আপনার গায়ের জামা তার চেয়ে বড় দেখছি, কারণ বলুন! ওমর তার বড় ছেলের দিকে তাকালেন। ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, আমার পায়জামার ভাগেরটা আব্বাকে দিয়েছি, যাতে ওনার গায়ের জামাটা দীর্ঘ হয়'। অতঃপর তিনি খুৎবায় দাঁড়ালেন *(ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইত্যাদি)*। এটাই হ'ল ইসলামী খেলাফতের অধীন জনগণের বাক স্বাধীনতা ও সরকারের জবাবদিহিতার নমুনা।

অথচ আধুনিক যুগের শাসনে আমরা কি দেখছি? দলীয় সরকার বা দলনেতারা যাকেই বিরোধী ভাবছেন, তাকেই বঞ্চিত করছেন তার ন্যায্য অধিকার থেকে। ওএসডি ও পানিশমেন্ট ট্রান্সফারের ভয়ে আতংকিত সবাই। ২৫ ফেব্রুয়ারী '০৯ পিলখানার মর্মান্তিক ট্রাজেডীর পর ১লা মার্চ সেনাকুঞ্জে ক্ষুব্ধ সেনা সদস্যগণ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে তাদের ক্ষোভ ও দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন একজন মহিলা ক্যাপ্টেন সহ যে সাতজন সেনা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, তাদেরকে পরে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এটা কেমনতরো বাক স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার নমুনা হ'ল? মানুষ কখন কার রোষানলে পড়বে, আর জবাই হ'য়ে বা গুলি খেয়ে পড়ে মরে থাকবে কিংবা কখন কার ইঙ্গিতে রাতের অন্ধকারে এসে তুলে নিয়ে গিয়ে খতম, গুম অথবা পঙ্গু করবে অথবা মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠাবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এখন রাস্তাঘাটে তো বটেই, নিজ বাড়ীতেও নারীর ইযযতের গ্যারান্টি নেই। অন্নকষ্টে জর্জরিত মা নিজ হাতে নিজ সন্তানকে মেরে ফেলছে ও নিজে আত্মহত্যা করছে। কেউবা সন্তান বিক্রি করছে। চাঁদাবাজের ভয়ে মানুষ আজ তটস্থ। ফলে ‘স্বাধীনতা দিবস' এখন আর কারো অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করে না। যা কেবল টি-ভি পর্দায় দেখা যায়, মনের পর্দায় নয়। তবুও স্বাধীনতার চেতনা আছে, থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতার দর্শন থাকবে চির অম্লান, চির জাগরুক। আমরা আমাদের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা চাই। সকল প্রকার যুলুম থেকে মুক্তি চাই। মযলূম মানবতার পক্ষে বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিকটে স্বাধীনতার এ মাসে এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

৮. সংস্কৃতি দর্শন[৮]

মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি'। 'সংস্কৃতি' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংস্কৃতিবান মানুষকে চেনা যায় তার বাহ্যিক ব্যবহারে, পোষাকে ও আচরণে এবং তার সার্বিক জীবনাচারে। প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা রয়েছে। এগুলি সংস্কৃতির বিষয়ভুক্ত নয়। কিন্তু এই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য যে নিয়ম ও ধরন আমরা অনুসরণ করি এবং যে পন্থা ও পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করি, সেটাই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। একজন ব্যক্তি শূকর-বিড়াল, ইঁদুর-কুকুর, কুচে-কচ্ছপ, ব্যাঙ, তেলাপোকা পুড়িয়ে মজা করে খায় ও মেহমানকে খাওয়ায়। আরেকজন ব্যক্তি এগুলো নিষিদ্ধ মনে করে বিরত থাকে এবং তার বদলে মুরগী-পাখি, গরু-খাসি আল্লাহ্র নামে যবেহ করে তেল-মশলা দিয়ে রান্না করে খায়। দু'জনের রুচি ও সংস্কৃতি পৃথক। একজন ব্যক্তি নদীর ময়লা ও ঘোলা পানিকে পবিত্র মনে করে সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে পুণ্যস্নান করে পাপমুক্ত হয়। অন্যজন এটাকে অনর্থক কাজ ভেবে দূরে থাকে। একজন লোক একটি ডুবন্ত মানব শিশুকে বা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় একজন মানুষকে বাঁচানোর চাইতে একটি দুর্লভ ছবি, মূর্তি বা ভাষ্কর্যকে বাঁচানো বা খেলা ও খেলোয়াড়ের পিছনে অঢেল পয়সা খরচ করাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আরেকজন তার বিপরীত। একজন লোক নারী-পুরুষের বেপর্দা চলাফেরা ও ফ্রি সেক্সকে স্বাভাবিক বিষয় মনে করে। আরেকজন তার বিপরীত। এগুলি সাংস্কৃতিক পার্থক্যের নমুনা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। ফলে মানুষের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা-বিশ্বাস, পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক রসম-রেওয়াজ এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সবকিছুই সংস্কৃতির উপাদানে পরিণত হয়। সংস্কৃতি তাই একজন মানুষের, একটি পরিবারের ও সমাজের এবং একটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, সংস্কৃতির দর্শন কী? জবাব : সংস্কৃতির দর্শন হ'ল মানুষের স্বভাবধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন। যে দর্শন উক্ত স্বভাব ধর্মের যথার্থ বিকাশে বাধা দেয় বা পথভ্রষ্ট করে, তা প্রকৃত অর্থে কোন সংস্কৃতি নয়।

এরপর প্রশ্ন হ'ল মানুষের স্বভাবধর্ম কী? জবাব : মানুষের স্বভাবধর্ম হ'ল তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাঁর বিধানের আনুগত্য করা। যেমন সন্তানের স্বভাবধর্ম হ'ল পিতা-মাতার প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও অটুট আনুগত্য বজায় রাখা। বস্তুতঃ এটাই মানুষের ফিৎরত বা

৮. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০১০।

স্বভাবধর্ম। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, তার শৈশব-কৈশোর, যৌবন-বার্ধক্য, তার খাদ্য-পানীয়, রোগ-শোক, উন্নতি-অবনতি, শান্তি-অশান্তি সবই তার সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নাসা-র প্রেরিত রকেট মহাশূন্যে গিয়ে কতদিন থাকবে, কোথায় কি কাজ করবে সবই যেমন পৃথিবীর প্রেরণ কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত হয়, তেমনি অদৃশ্য জগত থেকে প্রেরিত রূহ দুনিয়াতে এসে মানব দেহে কতদিন অবস্থান করবে, কোথায় কি কি কাজ করবে, কতটুকু রূযী সে পাবে, সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগা হবে অর্থাৎ সে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে, সবই অদৃশ্য আসমানী কেন্দ্র থেকে পূর্বেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু মানুষ কোন যন্ত্র নয়, তাকে দেওয়া হয়েছে মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ। যা দিয়ে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা-গবেষণা করে। তার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য অনুধাবন করে ও আল্লাহ্র অতুলনীয় সৃষ্টিরাজি থেকে কল্যাণ আহরণ করে। আল্লাহ দেখেন তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী কাজ করে বান্দা পৃথিবীকে আবাদ করছে, নাকি নিজের খেয়াল-খুশীর শয়তানী বিধান মেনে কাজ করতে গিয়ে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। মূলতঃ এটাই হ'ল পৃথিবীতে বান্দার জন্য মূল পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ এক সময় তার জীবনের সুইচ অফ হয়ে যায়। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই তার রূহ দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ ছেড়ে সেখানে চলে যায়, যেখান থেকে সে প্রথম দুনিয়াতে এসেছিল মায়ের গর্ভে চার মাসের ছোট্ট দেহে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে আর ধরে রাখতে পারে না, যখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ডাক আসে। কেননা সে তাঁর হুকুম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এর মধ্যে মানবীয় দর্শনের তিনটি দিক ফুটে ওঠে। (১) মানুষের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন (২) মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ্র বিধান প্রেরিত হয় এবং (৩) মৃত্যুর পরে মানুষকে ফিরে যেতে হয় তার পূর্বের ঠিকানায়। প্রথমটিকে বলা হয় 'তাওহীদ'। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন। যিনি পালনকর্তা, রূযীদাতা ও বিধানদাতা। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'রিসালাত'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বিধান সমূহ প্রেরণ করে থাকেন। তৃতীয়টিকে বলা হয় 'আখেরাত'। যেখানে বান্দার সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়া হয় ও সেমতে তার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্তির সার্বিক জীবন উপরোক্ত মানবীয় দর্শন দ্বারা পরিচালিত হবে, তার জীবন হবে সুনিয়ন্ত্রিত এবং তিনি হবেন সত্যিকারের সংস্কৃতিবান মানুষ। পক্ষান্তরে যার জীবন উপরোক্ত দর্শনের বাইরে পরিচালিত হবে, তার জীবন হবে অনিয়ন্ত্রিত, অসংস্কৃত এবং তিনি হবেন পথচ্যুত।

প্রথমোক্ত দর্শনের আলোকে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় ইসলামী সংস্কৃতি। যা বিশ্বমানবতাকে এক আল্লাহ্র সৃষ্টি ও এক আদমের সন্তান বলে গণ্য করে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও অঞ্চলের বৈষম্য তাকে মানবতার প্রতি উদার কর্তব্যবোধ

থেকে বিরত রাখতে পারে না। এর বিনিময়ে সে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি কামনা করে। দুনিয়াকে সে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র মনে করে।

অতঃপর শেষোক্ত দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে বলা হয় সেক্যুলার বা বস্তুবাদী সংস্কৃতি। যা আসলে কোন সংস্কৃতিই নয় বরং বিকৃতি। এখানে বস্তুই হয় প্রধান। যেকোন মূল্যে বস্তু অর্জন ও ভোগ করাই তার মূল লক্ষ্য হয়। মানুষ ও মানবতা তার নিকটে গৌণ এবং অনিরাপদ হয়। বস্তু লুট ও ভোগের জন্য সে মানুষ ও মানবতাকে ধ্বংস করতে আদৌ পিছপা হয় না। বিগত শতাব্দীর দু'দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমান শতাব্দীর ইরাক, আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশে চালানো ধ্বংসযজ্ঞ এবং বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে অশুভ শক্তিগুলির একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির শোষণ ও নির্যাতন উপরোক্ত বস্তুবাদী দর্শনেরই বাস্তব ফলশ্রুতি মাত্র। ভূগর্ভের তৈল ও অন্যান্য সম্পদ লুট করার জন্য তারা মাটির উপরে-নীচে বোমা মেরে অথবা কৃত্রিম সংকট সমূহ সৃষ্টি করে নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করে। অথচ মুখে সর্বদা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে। বাহ্যিকভাবে কোন ধর্মানুসারী ব্যক্তিও স্বার্থান্ধ হয়ে বস্তুবাদী হ'তে পারে। যুগে যুগে তাবৎ মুশরিক-ফাসিক ও মুনাফিকরা এই কাতারে পড়ে। যারা ধর্মকে স্রেফ কিছু আনুষ্ঠানিকতা মনে করে। এরা প্রকৃত অর্থে মানবীয় সংস্কৃতির ধারক ও অনুসারী নয়। তাই সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধানের সনিষ্ঠ অনুসারী ব্যক্তিই হ'ল প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

৯. নেতৃত্ব দর্শন[৯]

বহু-কে একক পথে পরিচালনার দর্শনকে বলা হয় 'নেতৃত্ব দর্শন'। সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতসমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নে'মত হ'ল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও গুণ-ক্ষমতা সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। বাকিরা তাদের অনুসরণ করে। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুণ আল্লাহ পশু-পক্ষীদের মধ্যেও দান করেছেন, যাতে তাদের সমাজ বিশৃংখলাপূর্ণ না হয় এবং তাদের ও মানুষের ক্ষতি কম হয়।

মানব সমাজে দু'ধরনের নেতা রয়েছেন। এক প্রকার নেতা সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। এঁরা নবী বা রাসূল হিসাবে অভিহিত। যারা সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ফলে তাদের প্রতিটি বিধানগত কথা, কর্ম ও আচরণ অন্য মানুষের জন্য যথাযথভাবে অনুসরণীয়। এঁদের সংখ্যা সীমিত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ। কেননা

৯. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০১০।

আল্লাহ প্রেরিত বিধানসমূহ কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে নাযিল হয়েছে, যা ইসলামী বিধান হিসাবে পরিচিত ও মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় একমাত্র দ্বীন হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনার জন্য অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার অবকাশ আর নেই। আল্লাহ কাউকে সে অনুমতি দেননি। যদি কেউ সে চেষ্টা করে, তবে তা কবুল করা হবে না বলে তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ১ লক্ষ ২৪ হাযার পয়গাম্বর হ'লেন যুগে যুগে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় নেতৃবর্গ। অতঃপর শেষনবী (ছাঃ) হ'লেন সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং ক্বিয়ামত অবধি সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়।

দ্বিতীয় ধরনের নেতা হ'লেন মানবীয় গুণসম্পন্ন সাধারণ সমাজনেতা। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ গুণাবলী ও যোগ্যতার ফলে তারা অন্যদের থেকে স্পষ্ট হয়ে যান। কিন্তু নেতৃত্ব যেহেতু চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়, তাই অন্যদেরকেই নেতা বাছাই করতে হয়। যোগ্য নির্বাচক ব্যতীত যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। নেতৃত্বের গুরুত্ব গাড়ির চালকের মত। যাকে সর্বদা যোগ্য, দক্ষ, সাহসী, দূরদর্শী, সদা-সতর্ক ও কর্তব্যনিষ্ঠ হ'তে হয়। নইলে যে কোন সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর চালকের যোগ্যতা ও দক্ষতা কেবল তিনিই যাচাই করতে পারেন, যিনি নিজে এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। মানুষ এ বিষয়ে ভুল করবে জেনেই আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে নবী ও বিধি-বিধান প্রেরণ করে সমাজ পরিচালনার পথ ও পদ্ধতি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এখন নবীগণের দেখানো পথে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করবে মাত্র। এ জন্য যিনি নেতা নির্বাচিত হবেন, দেখতে হবে তিনি আল্লাহ্র দেখানো পথে সমাজ পরিচালনায় কতটুকু যোগ্য হবেন। নির্বাচকগণ তাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করবেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে এবং সম্যক দূরদর্শিতা সহকারে। যদি তারা তাতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও তারা গোনাহগার হবেন।

সমাজের সীমিত সংখ্যক লোক জ্ঞানী ও দূরদর্শী হয়ে থাকেন। নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব মূলতঃ তাদেরই। অন্যেরা কেবল সমর্থন করবেন। এর বাইরে নেতৃত্ব নির্বাচনের সকল পথই ধোঁকা ও প্রতারণায় পূর্ণ। বিগত ও বর্তমান যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এর জলজ্যান্ত প্রমাণ।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, নেতৃত্বের দর্শন কি? জওয়াব : নেতৃত্বের দর্শন হ'ল, অনুসারীগণকে যথাযথভাবে আল্লাহ্র পথে পরিচালনা করা। যে নেতা যথার্থভাবে

এতে সক্ষম হবেন, সে নেতাই প্রকৃত সফলকাম হিসাবে বিবেচিত হবেন। যে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংগঠনে এই ধরনের নেতৃত্ব বেশী থাকবে, সে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংগঠন তত বেশী মযবুত ও সফলকাম হবে। যে জাতি এইরূপ নেতৃত্ব লাভ করেছে, সে জাতি ধন্য হয়েছে। মানুষকে সে জন্য সর্বদা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, '(হে প্রভু!) তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হ'তে অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং সাহায্যকারী দান কর' *(নিসা ৪/৭৫)*। আর সফলতার মাপকাঠি হ'ল আখেরাতে মুক্তি লাভ, দুনিয়ার সমৃদ্ধি ও গৌরব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা নেতৃত্ব ঐ ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করি না, যে তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাঙ্খা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৬৮৩)*। মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তান প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নানাবিধ চটকদার বক্তব্য ও লোভনীয় প্রতিশ্রুতির ফাঁদে ফেলে মানুষকে সে জাহান্নামের দিকে তাড়িত করছে। সেজন্য সর্বাগ্রে সে নেতাদের পথভ্রষ্ট করে। যাতে তার সঙ্গে তার অনুসারী সমাজ ও সংগঠন পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনব্যবস্থা। অতএব নেতৃত্বের প্রকৃত দর্শন মনে রেখে দেশের নির্বাচন কমিশন এবং সমাজের সচেতন ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের পা ফেলতে হবে। যাতে সর্বত্র আল্লাহভীরু ও যোগ্য নেতৃত্ব দায়িত্বে আসেন ও কর্মতৎপর থাকেন। এ জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

১০. ঐক্য দর্শন[১০]

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ ব্যতীত সে বাঁচতে পারে না। আর সমাজ থাকলে সেখানে ঐক্য চেতনা থাকবেই। যদিও সেখানে অনৈক্যের চেতনাও থাকে। চিন্তা ও চেতনার ঐক্য মানুষকে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে। একইভাবে অনৈক্য তাকে বিভক্ত ও দুর্বল করে। মানুষের মধ্যে মতভেদ সাধারণতঃ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। এক- স্বভাবগত মতভেদ, যা থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহ এটা করেছেন। যেমন একই বিষয়ে পাঁচ জনের পাঁচটি মত আসলো। দেখা গেল তার মধ্যে একটি মত অধিকতর কল্যাণবহ। তখন সকলে সেটা গ্রহণ করল ও উপকৃত হ'ল। এভাবে জ্ঞান ও বুঝের ভিন্নতার মধ্যেই সমাজের মঙ্গল ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। কেউ বিজ্ঞান ভাল বুঝেন, কেউ ব্যবস্থাপনা ভাল বুঝেন, কেউ ব্যবসা ভাল

---

১০. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৯।

বুঝেন। আবার একই বিষয়ে কেউ বেশী কেউ কম বুঝেন। এভাবেই সমাজ এগিয়ে চলে। এসব মতভেদ তাই কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন, 'এজন্যেই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন' *(হূদ ১১/১১৮)*।

মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হ'ল আল্লাহ্র বিধানের উপর মানবীয় বিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটাই মানব সমাজকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা এটি হেদায়াতের আলোকবর্তিকাকে ঢেকে দেয়, যা আসমান থেকে যমীনে অবতীর্ণ হয়েছিল প্রবৃত্তিপরায়ণতার অনিষ্টকারিতা হ'তে মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্যে। মানুষের জ্ঞান সীমিত। সে জানেনা তার ভবিষ্যৎ প্রকৃত মঙ্গল কিসে আছে? তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, তাকে পথ চলার জন্য আল্লাহ যে সামান্য জ্ঞান দিয়েছেন, তাতেই সে নিজেকে বড় জ্ঞানী ভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত কেই নিজের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর মনে করে। অথচ তার প্রকৃত কল্যাণ কিসে, সেকথা তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। আর এজন্যেই মানুষকে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। ঐ রজ্জু ছেড়ে দিলে মানুষ ছিটকে পড়বে অনৈক্য ও অশান্তির হুতাশনে, যেখান থেকে সে আর উঠে আসতে পারবে না, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত। ঐ রজ্জু হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। মানুষ যাতে ঐ রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেজন্য তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট বিধান সমূহ এসে যাওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছে। বস্তুতঃ ওদের জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। যারা ঐ রজ্জুধারী হবে, তারা পরস্পরে মহব্বত ও ভালোবাসার মাধ্যমে একটি দেহের ন্যায় সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী হবে। একটি দালানের সিমেন্ট ঢালা ইটের ন্যায় একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকবে। দেহের একটি অঙ্গে আঘাত হ'লে আরেকটি অঙ্গ ব্যথাতুর হবে। নিদ্রায় ও জাগরণে সর্বদা পরস্পরের সমব্যথী হবে। তারা সর্বদা উক্ত রজ্জু বিরোধীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন হবে এবং নিজেদের মধ্যে রহমদিল হবে।

এক্ষণে আল্লাহ প্রেরিত ঐক্যদর্শন হ'ল আমরা সবাই এক আদমের সন্তান। কারু উপরে কারু প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। অতএব সকলের প্রতি বিনয় ও সহনশীলতাই হবে মানবীয় ঐক্যের ভিত্তি। যে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে মানুষকে আহ্বান জানানো হয় তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের অনুসরণের প্রতি। যারা সে আহ্বানে সাড়া দিবে, তারা আমার ভাই। আর যারা সাড়া দিবে না, তাদের প্রতি কোন যবরদস্তি নেই। তবে একথা তাদের নিকট স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, আল্লাহ্র আনুগত্যেই উত্থান ও তাঁর অবাধ্যতায়

পতন অবশ্যম্ভাবী। আর সে আনুগত্যের জন্য আক্বীদা ও আমলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হওয়া এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেছীনের বুঝ অনুযায়ী দ্বীনের বুঝ হাছিল করা আবশ্যক। এর বাইরে গেলে শয়তানী খপ্পরে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ইসলামের মৌলিক নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নানা কারণে এখানে সকল মুসলমান এক জামা'আতভুক্ত নয় বা হ'তে পারে না। যদি কারণগুলি পরস্পরে বিদ্বেষমূলক ও শত্রুতামূলক হয় এবং ইসলামী আদর্শের বাইরে বিজাতীয় কোন আদর্শের বাস্তবায়ন লক্ষ্য হয়, তাহ'লে ঐসব দল ও সংগঠন জাহেলিয়াতের সংগঠন হবে এবং ঐসবের অন্তর্ভুক্ত সকলে আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে। হাদীছে এদেরকে 'জাহান্নামী দল' বলা হয়েছে। যদিও এরা ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে ও ধারণা করে যে, তারা মুসলিম *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। আর যদি কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সে আলোকে সমাজ সংস্কার হয়, তাহ'লে তা হবে সত্যিকারের ইসলামী সংগঠন। তার সংখ্যা একাধিক হ'লেও তা দোষের হবে না। বর্তমান কম্পিউটার যুগে এইসব সংগঠন দ্রুত একত্রিত হ'তে পারে এবং যেকোন ইসলামী বিষয়ে দ্রুত পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশে সেক্যুলার সংগঠনগুলির চাইতে ইসলামী সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীরা যেন মনে হয় অধিক দুনিয়াদার। 'মত পার্থক্যসহ ঐক্য' ফর্মুলা অনুসরণ করে দীর্ঘ সিকি শতাব্দীর অধিককাল ধরে (১৯৭৮-২০০৫) একটি ইসলামী দলের ঐক্য প্রচেষ্টা এবং জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের পরলোকগত খতীবের আন্তরিক প্রচেষ্টার (১৯৯৮-২০০৫) ব্যর্থতার যে কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তার সারকথা দাঁড়ায় একটাই, 'দুনিয়া'। স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থের কারণেই দেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দ এক প্লাটফরমে আসতে পারেননি। এই ব্যর্থতার একটা মৌলিক কারণ নির্দেশ করা যায়। সেটি হ'ল তাদের পুরা চেষ্টাটাই ছিল ক্ষমতাকেন্দ্রিক। কীভাবে সেক্যুলারদের হটিয়ে ইসলামী নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো যায়, অথবা সেক্যুলারদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করা যায়, সেটাই ছিল তাদের দীর্ঘ ঐক্য প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। এর ফলে তারা দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা ও বিভেদের বীজ তাদের অজান্তেই বপন করেছেন। তার চাইতে যদি তাঁরা সমাজ সংস্কারকে লক্ষ্য বানাতেন এবং কথিত সেক্যুলার নেতাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতেন, তাহ'লে তারা আদৌ সেক্যুলার থাকতেন কি-না সন্দেহ। আলেমগণ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় না গিয়ে অভিভাবকের ভূমিকায়

থাকলে এবং প্রচলিত পুঁজিবাদী ও পাশ্চাত্যের দুনিয়াদার রাজনীতির নৌকায় চড়ে ইসলাম কায়েমের দুঃস্বপ্ন না দেখলে এদেশে ইসলামের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত।

বিস্ময়কর এই যে, এইসব ইসলামী নেতারাই আবার সেক্যুলার নেতাদের সাথে জোট করার জন্য ও তাদের করুণায় মন্ত্রী হবার জন্য লালায়িত হন। আর যদি মন্ত্রী হ'তে পারেন, তখন তাদের প্রধান টার্গেট হয় সমমনা আরেকটি ইসলামী দল বা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা। দলীয় সংকীর্ণতার চরম পরাকাষ্ঠা তারা যা দেখিয়ে থাকেন, সেক্যুলার নেতারাও তাতে লজ্জা পান। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিচারনীতি সবটাই ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী। বামপন্থীরাই বরং এ ক্ষেত্রে বেশী সোচ্চার। অতএব ইসলামী সংগঠনগুলির দায়িত্ব হ'ল এই প্রতারণাপূর্ণ ও পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। কিন্তু তারাই যদি ঐসব ইসলাম বিরোধী আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেন এবং সেগুলির মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের শপথ নেন, তবে সেটা স্রেফ ময়লার ড্রেনে নেমে গায়ে সাবান দেওয়ার মত হবে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন সংগঠন ব্যতীত সম্ভব নয়। এমনকি ছহীহ হাদীছের একটি বিধান ব্যক্তি জীবনে কায়েম করতে গেলেও সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজন। সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি ছহীহ হাদীছের বিধান দ্রুতবেগে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়ে যায় স্রেফ একটি নির্দেশনার মাধ্যমে। অতএব সব দলের নেতাদের প্রেসিডিয়াম সদস্য বানিয়ে পর্যায়ক্রমে নেতা বানানোর সুযোগ দিয়েও একই মাযহাবের আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারার দীর্ঘ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা হাদীছপন্থী হবার দাবীদারগণের সাবধান হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি। যদিও পথভ্রষ্ট আলেমদের তওবা করে ফিরে আসার নযীর ইতিহাসে একেবারেই বিরল।

বর্তমানে জামা'আতী যিন্দেগীর বিরুদ্ধে দু'ধরনের প্রচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অনেক দ্বীনদার ভাই-বোনকে সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এক- এর ফলে সমাজে বিভক্তি ও বিশৃংখলা বৃদ্ধি পায় এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপকতা বেড়ে যায়। দুই- একাকী ছহীহ হাদীছ মেনে চলে ভাল মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট নিরাপদ ও সমাজের জন্য কম ক্ষতিকর'। দু'টির পিছনেই কম-বেশী যুক্তি রয়েছে। কিন্তু দু'টিই কুরআন-হাদীছের বিরোধী। কেননা ইসলামের পুরো বিধানই সামষ্টিক। এমনকি ছালাত আদায় করলেও একাকীর চাইতে জামা'আতে ছালাতের নেকী ২৭গুণ বেশী। যদিও একাকী ছালাতে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ বেশী দেওয়া যায়। তিনজনে সফরে গেলেও

একজনকে 'আমীর' বানিয়ে সুশৃংখলভাবে সফরের নির্দেশ এসেছে হাদীছে। 'আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে জামা'আতের উপরে'। 'জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে বাঘে ধরবে' বলে হাদীছে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। 'শক্তিশালী মুমিনকে দুর্বল মুমিনের চাইতে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়' বলা হয়েছে। এমনকি একটি রাত ও একটি দিন আমীরবিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই তাঁর জানাযার চাইতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় 'খলীফা' নির্বাচনকে। উপরোক্ত সব নির্দেশনা সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। অতঃপর সংগঠনের মাধ্যমে শিরক-বিদ'আতের প্রচলন যেমন সহজ হয়, তার উৎসাদন করাও তেমনি সহজ হয়। অতএব এ যুক্তি ধোপে টিকে না। দ্বিতীয়তঃ একাকী ভাল থাকার যুক্তি আরও হাস্যকর। কেননা তখন তাকে গাইড করার কেউ থাকে না। ফলে এক সময় সে স্বেচ্ছাচারিতার শয়তানী খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর অসংখ্য নযীর ভুক্তভোগীদের সামনেই রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তার এ একাকী বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পসন্দনীয় নয়। অতএব তা কোন দ্বীনদার ব্যক্তির পসন্দনীয় হ'তে পারে না।

ইসলামে ফির্কাবন্দী নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। সেগুলি ঐ ফের্কা যা মন্দ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। যদিও মুখে সবাই সুন্দর কথা বলে থাকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা যাদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী এবং যতক্ষণ তারা কর্মতৎপর থাকবে, ততক্ষণ সেখান থেকে বের হয়ে যাবার কোন অবকাশ যেমন নেই, তেমনি পৃথক দল গঠনেরও কোন সুযোগ নেই। সেটা করলে স্রেফ দলবাজি হবে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ *(আন'আম ৬/১৫৯)*। হিংসা ও অহংকার নামক দু'টি নিকৃষ্ট রোগ যার মধ্যে প্রবল, তার ইহকাল ও পরকাল দু'টিই বরবাদ *(মুসলিম হা/৯১)*। অতএব পরস্পরের বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত, অপবাদ ও মিথ্যা রটনা কখনোই কোন ইসলামী কর্মসূচী হ'তে পারে না। যারা এসব করে ও এতে আনন্দ পায়, তাদের চাইতে হতভাগা আর কেউ নেই। এখানে কোন্ দল আগের ও কোন্ দল পরের, সেটা দেখার বিষয় নয়। বরং দেখার বিষয় হ'ল কোন্ সংগঠন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কতটুক অনুসারী এবং কথায় ও কাজে মিল কতটুকু ও তারা কতটুকু কর্মতৎপর, সেটা যাচাই করা। এর বাইরে মূল্যায়নের আর কোন মানদণ্ড নেই।

কুরায়েশদের কাছে ইবরাহীমী ধর্মের বড়াই ছিল। তারা নিজেদেরকে 'আহলুল্লাহ' বলত। সেকারণ তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'ছাবেঈ' (ধর্মত্যাগী) 'সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী' বলে অপবাদ দিয়েছিল। অথচ কুরায়েশ নেতারাই ছিল পথভ্রষ্ট। অতএব পুরানো সংগঠনের বড়াই করে লাভ হবে না। বরং ছহীহ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী ও তাক্বওয়াশীল সংগঠনকে স্বাগত জানাতে হবে, এটাই

নিয়ম। পিছনের দোহাই দেওয়াটা জাহেলী যুগের লক্ষণ। আবার ইজতিহাদের দোহাই দিয়ে ইসলামকে পাশ্চাত্যের পুচ্ছধারী বানানোর চেষ্টা ইক্বামতে দ্বীনের কোন অংশ নয়; বরং ওটা দ্বীন ধ্বংসের নামান্তর। ইসলাম ইসলামই। তাকে মডার্ণ বা মডারেট বানানোর অপচেষ্টা ছাড়তে হবে এবং আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এক্ষণে জাতির প্রকৃত ঐক্য দর্শন হ'ল হাবলুল্লাহ্র দর্শন। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার মানদণ্ডে সমাজকে গড়ে তোলাই হ'ল মানবীয় ঐক্যের স্থায়ী দর্শন। এর বাইরে কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমরা সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলি! আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

১১. অর্থনৈতিক দর্শন[১১]

মানুষ যে নীতির ভিত্তিতে তার আয়-ব্যয় পরিচালনা করে তাকে 'অর্থনীতি' বলা হয়। পৃথিবীতে মনুষ্য বসতির পর থেকেই মানব সমাজে পারস্পরিক অর্থনৈতিক লেনদেন চলে আসছে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে সর্বযুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে আসছে। **এক-** অবাধ ব্যক্তি মালিকানা ও সীমাহীন ভোগের অধিকার। আর এটা হ'ল মানুষের স্বভাবজাত মন্দ প্রবণতা। **দুই-** সম্পদে আল্লাহ্র মালিকানা স্বীকার করা ও তাঁর প্রদত্ত হালাল-হারামের বিধান মেনে চলা। এতে ব্যক্তির আয়-উপার্জনে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং সমাজের সবল-দুর্বল সকলের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সরবরাহ নিশ্চিত হয়। প্রথমোক্ত অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলা হয়। সেযুগে ফেরাঊনী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেভাবে ক্বারূনী অর্থনীতিকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর রক্ত শোষণ করত। এযুগে তেমনি কথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি স্ব স্ব দেশের পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর রক্ত শোষণ করে থাকে। শ্রমিকদের উঁচু-নীচু অবস্থার দিকে তাকালেই এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। ভোগের যথেচ্ছ অধিকার ও নিরংকুশ মালিকানা লাভের উদগ্র লালসা সমাজে হিংসা-হানাহানি, রক্তপাত, জিঘাংসা ও সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। বর্তমানে কেবল নাম ও ধরনের পার্থক্য হয়েছে, চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি।

---

১১. আত-তাহরীক ১৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৯।

মাঝখানে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে হেগেল, মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্ভাবিত পথে শ্রেণী সংগ্রামের নামে ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের একটা সংঘবদ্ধ ও নিষ্ঠুর আন্দোলন গড়ে ওঠে। যাতে উভয়পক্ষে কয়েক কোটি মানুষের জান-মাল ও ইযযতের বিনিময়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কায়েম হয়। অবাধ ব্যক্তি পুঁজিবাদে অনেক সময় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ তাদের শ্রমিকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু 'সর্বহারাদের স্বর্গ' নামে কথিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমিকদের এই সামান্য দয়া পাওয়ারও সুযোগ নেই রাষ্ট্রীয় আইনের বাজ্রয় নিষ্পেষণের কারণে। এখানে অর্থনৈতিক শক্তির সাথে রাজনৈতিক শক্তি একীভূত হওয়ায় এর শোষণটা হয় যেমন সর্বাত্মক, তেমনি নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক। অবাধ ব্যক্তি পুঁজিবাদে বিভিন্ন জনের কাছে পুঁজি জমা হয়। যার ফলে সমাজদেহের রক্ত বিভিন্ন স্থানে ব্লক্ড হয়ে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। যা সমাজে অস্বাভাবিক ধন বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং এক সময় সমাজকে মৃতপ্রায় করে দেয়। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট সমাজে সকল পুঁজি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় এবং রাষ্ট্রের নামে কতিপয় পার্টি লীডারের হাতে মানুষকে যিম্মী হ'তে হয়। এভাবে দেহের সকল রক্ত মাথায় জমা হয়ে যায়। ফলে দেহ রক্তশূন্য হয়ে এক সময় মারা পড়ে। মানুষ গোয়ালের গরু-ছাগলের মত কিংবা জেলখানার হাজতী-কয়েদীর মত রাষ্ট্রের দেওয়া খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী হয়। তার নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি বা মেধা ও যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন সেখানে থাকে না। From each according to his labour. To each according to his need. 'প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হবে তার শ্রম এবং দেওয়া হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী'- এই নীতির ভিত্তিতে কথিত সাম্যবাদী অর্থনীতি পরিচালিত হয় বলে দাবী করা হয়। ফলে যে ব্যক্তি শ্রম দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না, অথবা যে ব্যক্তি অন্যের চাইতে অধিক শ্রম দেয় কিংবা অধিক মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী, তার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। এ কারণে বহু ঢাক-ঢোল পিটানো বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম পঞ্চাশ বছরও টিকে থাকতে পারল না। বিপুল বেগে তারা ফিরে গেছে ফেলে আসা পুঁজিবাদের দিকে। এখন রাশিয়া ও চীনের পুঁজিপতিরা আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিদের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। যদিও তারা মুখে সমাজতন্ত্রের নাম নিচ্ছে কঠোরতম একদলীয় স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। ফলকথা এই যে, অবাধ ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ দু'টিই চরমপন্থী মতবাদ এবং দু'টিই মানুষের স্বভাবধর্মের ঘোর বিরোধী।

উপরোক্ত দু'ধরনের পুঁজিবাদের বিপরীতে আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি হ'ল শরী'আহ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাধীন সামাজিক ন্যায়বিচারপূর্ণ অর্থনীতি। এখানে

সম্পদের প্রকৃত মালিক ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নয়, বরং আল্লাহ। এখানে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। যাতে সে তার নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতাকে সাধ্য অনুযায়ী কাজে লাগাতে উৎসাহিত হয়। তবে সে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধি-বিধান মতে আয় ও ব্যয় করবে। এখানে তার কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। এখানে সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি নয়, আবার ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়। উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী। ধনীকে তার উদ্বৃত্ত ধন গরীবকে দিতেই হবে। এটা গরীবের প্রতি করুণা নয়, বরং ধনীর সম্পদে গরীবের হক ও সুস্পষ্ট অধিকার *(মা'আরেজ ৭০/২৪)*। গরীবকেও তেমনি ধনীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কারণ তার মধ্যে অনুরূপ মেধা ও যোগ্যতা নেই। শিল্পপতি তার পুঁজি বিনিয়োগ করবে। কিন্তু কারখানা চালাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। উভয়কে উভয়ের স্বার্থ দেখতেই হবে আল্লাহ্‌র দেওয়া ন্যায়বিধান অনুসরণে, ক্বারূনী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। শ্রমিকরা কেবল বেতনভুক শ্রমিক হবে না, তারাও কারখানার মালিকানার অংশীদার হবে। মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে যেমন মালিকানার দাবীদার হয়েছেন, শ্রমিক তার শ্রম বিনিয়োগ করে তেমনি তুলনামূলক মালিকানা লাভ করবে। লাভ ও লোকসানের ঝুঁকি মালিক ও শ্রমিক উভয়ে নেবে। এতে কারখানার উন্নতির প্রতি উভয়ের লক্ষ্য ও তদারকি থাকবে নিজের সম্পত্তির মতো। উভয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বত্র অর্থের সরবরাহ বাড়বে। সমাজদেহের সর্বত্র রক্ত চলাচল করবে। সুস্থ প্রতিযোগিতায় সমাজে সচ্ছলতার আনন্দ বয়ে যাবে। শ্রমিক অসন্তোষ বলে কিছুই থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী অর্থনীতিতে আখেরাতমুখী নৈতিকতাই প্রধান। এখানে ধনী-গরীবের বৈষম্যকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে অগ্রগণ্য রাখা হয়। ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ধনীকে তার উদ্বৃত্ত অর্থ গরীবকে দান করতে হয় *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। ভোগে নয়, ত্যাগেই এখানে আনন্দ। এটা আল্লাহকে দেওয়া ঋণ। এই ঋণ তার পরকালের আমলনামায় অফুরন্ত প্রবৃদ্ধির সাথে সঞ্চিত হয় *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। যার মালিক সে কেবল একাই হবে। সেখানে কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। আল্লাহ্‌র দেওয়া সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, বৃষ্টির পানি ভোগের অধিকার ধনী-গরীব সকলের জন্য সমান। কিন্তু ব্যক্তিগত মেধা ও যোগ্যতার পার্থক্য জন্মগতভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ একে অপরের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে এবং পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে ও আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকে। এই পার্থক্য ও বৈষম্যকে অস্বীকার করা যেমন হঠকারিতা, একাই সবকিছু ভোগের অধিকার দাবী করাও তেমনি হঠকারিতা। ধনের নেশায় মত্ত ও সম্পদের অহংকারে স্ফীত মালিক যখন গাড়ী হাঁকিয়ে বাড়ী থেকে বের হন, তখন তিনি

তার গরীব ড্রাইভারের মুখাপেক্ষী থাকেন। যখন ঐ মালিক রোগী হয়ে হাসপাতালে নীত হন, তখন ডাক্তার ও নার্সের মুখাপেক্ষী হন। অতএব তাকে অন্যের স্বার্থ দেখতেই হবে তার নিজের স্বার্থেই। যদি সবাই সমান অর্থ-সম্পদ এবং মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী হ'ত, তাহ'লে দুনিয়া অচল হয়ে যেত। মানুষ তার প্রয়োজন পূরণে কারুরই কোন সাহায্য পেত না। শিল্পপতি তার কারখানায় শ্রমিক পেত না। কৃষক তার জমিতে মজুর পেত না। অতএব হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করার অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা কেবল রঙিন ও কষ্ট কল্পনা মাত্র। কথিত সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম এখানেই ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, '...আমরা তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একে অপরের উপর তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে'... *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ধনীদের কাছ থেকে নাও ও গরীবদের মাঝে তা ফিরিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা তোমরা রূযীপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে' *(আবুদাঊদ হা/২৫৯৪)*। তিনি বলেন, 'দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/২৩৫৪)*। ধনী ও গরীবের মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকদের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের চাইতে উঁচু পর্যায়ের। যদি এই নীতি মেনে চলো, তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহ্‌র নে'মত সমূহকে তুমি ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না' *(মুসলিম হা/২৯৬৩)*। বস্তুতঃ এর মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও সুখের চাবিকাঠি। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রাপ্ত নে'মতকে অনেকের চাইতে অধিক দেখতে পাবে। এতে সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবে। পক্ষান্তরে উঁচু পর্যায়ের লোকদের দেখে নিজের মধ্যে যে ক্ষোভ ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়, সেটাও দূরীভূত হবে। ইসলামী অর্থনীতি এভাবেই সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শান্তি কায়েম করে। আর এটাই বাস্তব কথা যে, রুটির অভাব দারিদ্র্যের একমাত্র প্রমাণ নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অভাবই সমাজে দরিদ্রতার মূল কারণ।

পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হ'ল সূদ। যা শোষণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং যার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা *(ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯)*। পুঁজিবাদী ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এক সময় নিঃস্ব ও দেউলিয়া হবেই। পৃথিবীর বিগত সকল ধর্ম এবং প্লেটো, এরিষ্টটল সহ ইসলাম-পূর্ব যুগের সকল মানবতাবাদী ব্যক্তিবর্গ সূদের বিরুদ্ধে সাবধান করে গেছেন। অতএব সূদী শোষণে নিষ্পিষ্ট মানবতাকে

আজ ফিরে আসতে হবে ইসলামী অর্থনীতির দিকে, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ বিনির্মানের পথে। আয় ও ব্যয়ের সকল ক্ষেত্রে শয়তানের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্বের পথে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'তাওহীদে ইবাদত' কায়েমের শপথ নিয়ে। এটাই হ'ল ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন। প্রকৃত মানবতাবাদী বিশ্বদর্শন। এর মধ্যেই রয়েছে ধনী ও গরীব সকল মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ। সমাজের মঙ্গলকামী দূরদর্শী রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদগণকে আমরা সেদিকেই আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

১২. রাজনৈতিক দর্শন[১২]

রাজা যে নীতির ভিত্তিতে রাজ্য চালান, তাকে রাজনীতি বলা হয়। বিগত দিনে অনেক রাজা অত্যাচারী ছিলেন বিধায় এখন আর কেউ 'রাজা' কথাটা মুখে আনেন না। কিন্তু 'রাজনীতি' পরিভাষাটা কেউ ছাড়তে চান না। পরিভাষা যেটাই হৌক না কেন রাজনীতির মূল দর্শন হ'ল সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। সেটা কী হবে? এ বিষয়ে পৃথিবীতে সর্বযুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে আসছে। **এক-** সমাজভুক্ত লোকদের মতি-মর্যী অনুযায়ী সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। একে বলে জাতীয়তাবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র দর্শন। এইরূপ সমাজ বা রাষ্ট্রে সাধারণতঃ শক্তিশালী দল, শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়। কখনো ব্যক্তির নামে, কখনো জনগণের নামে এই লোকগুলিই হয় সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার। নেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এখানে নীতি হিসাবে গণ্য হয়, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই সমাজের রাজনীতি নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে থাকে। শাসকদলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা ও শাসনযন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মূর্তিমান শোষক ও জাল্লাদের রূপ ধারণ করে ও পুরা সমাজকে নরকে পরিণত করে। নেতা অনেক সময় এটা না চাইলেও তার করণীয় কিছুই থাকে না। কারণ দলের নেতা-কর্মীরা নাখোশ হ'লে দল টিকবে না, নেতাও টিকবেন না। নামে-বেনামে পৃথিবীতে যুগে যুগে এই ধরনের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। মযলূম ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ কখনোই এ নীতি সমর্থন করে না। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা এই যে, দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সাহায্যে ও সমর্থনেই এক শ্রেণীর লোক ক্ষমতা দখল করে এবং এদের উপরে যুলুম করে থাকে। যা আজও চলছে দোর্দণ্ড প্রতাপে নানা চটকদার নাম ও আকর্ষণীয় মোড়কের আড়ালে মুখ লুকিয়ে।

দুই- আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এই সমাজে শাসক-শাসিত সকলেই হয় আল্লাহ্র গোলাম। আর তাঁর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষ হয় সমান। এখানে নেতা বা শাসক কেবল আল্লাহ্র বিধানের প্রয়োগকারী

১২. আত-তাহরীক ১২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৯।

হয়ে থাকেন। জনগণ আল্লাহ্র বিধান সমূহকে হাসিমুখে বরণ করে নেয় দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে। আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস যেমন সবার প্রতি সমভাবে কল্যাণময় এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনি আল্লাহ্র দেওয়া বিধানসমূহ হয় সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণময় এবং অপরিবর্তনীয়। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন 'আল্লাহ'। আমীর বা খলীফা হন আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও জনগণের প্রতিনিধি। আমীর কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র বিধানকে এড়িয়ে যেতে পারেন না বা কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন না। তিনি তাঁর নিয়োজিত পার্লামেন্ট ও বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, যারা সর্বদা আল্লাহ্র বিধানের দাসত্ব করেন ও তাঁর বিধানের অনুকূলে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তার বাইরে যেতে পারেন না। কেননা আল্লাহ্র বিধানের বাইরে গেলেই তারা শয়তানের ফাঁদে আটকে যাবেন ও তাতে জনগণের ও সমাজের সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ হবে। এমনকি বিশ্ব প্রকৃতিতেও তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। আসমানী ও যমীনী গযব সমূহ নেমে আসবে। সাধারণ জনগণ সর্বদা আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ানুগ শাসন কামনা করেন। কিন্তু শয়তানের দাসত্বকারী কিছু মানুষ সর্বদা যুলুম, প্রলোভন ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে বশীভূত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে থাকেন।

যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই আহ্বান নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত (শয়তান) হ'তে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। কোন কোন নবী স্বয়ং রাষ্ট্রনেতা হিসাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেছেন। সে সময় পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বয়ে গেছে। সমাজ চিরদিন তাঁদের স্মরণ করে থাকে। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করাকেই বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত'। এদিকেই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ক্ষমতাগর্বী কুরায়েশ নেতাদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা বল *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* ('নেই কেউ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ ব্যতীত'), তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে'। এযুগেও আমাদের আহ্বান হ'ল 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'- তাহ'লেই হে পৃথিবীর মানুষ! তোমরা সফলকাম হবে'। নতুবা যুগে যুগে কেবল নেতার বদল হবে, কিন্তু মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। বরং দিন দিন অবনতি হবে।

প্রশ্ন হ'ল, সমাজে প্রচলিত জাহেলী বিধানের সাথে আপোষ করে কি আল্লাহ্র বিধান কায়েম করা সম্ভব? ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? নবীগণ কি শিরকের সাথে আপোষ করে দ্বীন কায়েম করেছিলেন?

কখনোই নয়। তাঁরা একা থেকেছেন। বছরের পর বছর সীমাহীন বাধা, অপবাদ ও অত্যাচারের তীব্র কষাঘাত সহ্য করেছেন। অনেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি যালেমদের হাতে জীবন দিয়েছেন। তথাপি বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। আজও যদি কেউ সমাজ পরিবর্তনে আকাংখী হন ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন, তাহ'লে অবশ্যই তাকে আপোষহীনভাবে নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাঁর প্রেরিত কিতাব ও দ্বীনকে অবশ্যই হেফাযত করবেন। আমাদের দায়িত্ব কেবল তাঁর দেখানো পথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল মানবকল্যাণের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। এ দুই উৎসের আলোকধারায় চলার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মানবজাতিকে তার জীবনপথ পাড়ি দিতে হবে। এপথে যিনি যতটুকু করবেন, ততটুকু প্রতিদান পাবেন। কিন্তু এর বাইরে পা ফেললেই তাকে শয়তানের বিছানো জালে জড়িয়ে যেতে হবে। যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ হয়ত আর কখনোই সে পাবে না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত।

আল্লাহ্র বিধান কায়েম হবে জন-ইচ্ছার উপরে ভিত্তি করে, অন্য কোনভাবে নয়। আর সেকারণ নবীগণ সর্বদা জনগণের কাছে গিয়েছেন। তাদেরকে বুঝিয়েছেন, ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এভাবে ব্যক্তি জীবন আল্লাহ্র দাসত্বে অভ্যস্ত হ'লে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। জনগণ স্বেচ্ছায় তা কবুল করবে। কোনরূপ প্রলোভন বা যবরদস্তির প্রয়োজন হবে না। অথচ করুণ বাস্তবতা এই যে, এদেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ আজ পর্যন্ত জানেন না তাওহীদ কী? আল্লাহ্র দাসত্বের সারবত্তা কি? আল্লাহ্র বিধান সমূহ কি? তাতে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ কী? তাদের অনেকে ছালাত-যাকাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালন করেন। অনেকে এসব ইবাদতকে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মনে করেন কিংবা দলীয় সমর্থন আদায়ের কৌশল মনে করেন। এমতাবস্থায় সাধারণ লোকদের অবস্থা কী, তা আঁচ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অতএব দ্বীন কায়েমের সুন্দর আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং আকাংখা বাস্তবায়নে নবীগণের তরীকার অনুসারী হওয়া আবশ্যক। নবীগণ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেননি। বরং শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া এবং তাঁর দাসত্বে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। হেদায়াত পাওয়া ও শাসনক্ষমতা লাভের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতেই নিবদ্ধ। দাওয়াত দেওয়া ফরয। দাওয়াতকে বিজয়ী করা ফরয নয়। কেননা সে দায়িত্ব আল্লাহ্র।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলিমদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে আল্লাহ্র পথে আদেশ ও শয়তানের পথ থেকে নিষেধ করার জন্য *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। তাদের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দর্শন হ'ল 'তাওহীদে ইবাদত'-এর দর্শন। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অতএব প্রচলিত শিরকী রাজনীতির বদ্ধ জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব বরণের মধ্যেই কেবল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। সমাজের কল্যাণকামী দূরদর্শী রাজনীতিকদের আমরা সেদিকেই আহ্বান জানাই।

১৩. শিক্ষা দর্শন[১৩]

সুষ্ঠু পন্থায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই হ'ল প্রকৃত অর্থে 'শিক্ষাদর্শন'।

'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে'। 'পড়! আর তোমার পালনকর্তা হ'লেন সর্বাধিক দয়ালু'। 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন'। 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। মানব জাতির জন্য শেষনবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে পাঠানো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আসমানী তারবার্তা এটি। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ'ল 'পড়'। যা অন্য কোন ধর্মে নেই। কার নামে পড়বে? কি পড়বে? কিসের মাধ্যমে শিখবে? শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? চারটি বিষয়ের জওয়াব রয়েছে উক্ত পাঁচটি আয়াতে। এর মধ্যেই রয়েছে ইসলামের 'শিক্ষাদর্শন'। আর তা হ'ল আত্মিক ও জৈবিক চাহিদার সর্বোত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে মানবতার সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধন। আর এটাই হ'ল 'বিশ্ব মানবতার শিক্ষাদর্শন'। কেননা ইসলাম এসেছে মানব জাতির কল্যাণে। তার সকল নির্দেশনা বিশ্ব সমাজের উদ্দেশ্যে বিধৃত। মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলাম এসেছিল অমুসলিমদের কাছে। তারাই এ শিক্ষাদর্শন কবুল করেছিল ও জগতে বরেণ্য হয়েছিল। তাই ইসলামী শিক্ষাদর্শনই মানব জাতির জন্য প্রকৃত শিক্ষাদর্শন। আয়াত পাঁচটির গুরুত্ব বিবেচনায় এর পর থেকে 'অহি' নাযিল হওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যাকে 'অহি-র বিরতি কাল' বলা হয়।

উক্ত দর্শনে বলা হয়েছে যে, মানুষ পড়বে তার প্রভুর নামে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি হ'লেন সবচেয়ে দয়ালু। তাঁর উপরে কেউ নেই। অর্থাৎ মানব শিশু প্রথমেই জানবে যে সে আল্লাহ্র সৃষ্টি। সে প্রকৃতির সৃষ্টি নয় বা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, কিংবা বানর-হনুমানের বিবর্তিত কোন লেজখসা দ্বিপদ প্রাণী

১৩. আত-তাহরীক ১২তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগস্ট ২০০৯।

নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন : সে কি পড়বে? জওয়াব : সে পড়বে এমন কিছু যা তাকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দিবে ও যাকে সে ইবাদত করবে। অতঃপর সে তার বিধান সমূহ জানবে, যা তার আত্মা ও দেহ উভয়ের চাহিদা মিটাবে। যে দেহ আলাক্ব থেকে সৃষ্ট। তৃতীয় প্রশ্ন : কিসের মাধ্যমে শিখবে? জওয়াব : সে কলমের মাধ্যমে শিখবে। এর মধ্যে যবান ও অন্যান্য মাধ্যমসমূহ শামিল রয়েছে। চতুর্থ প্রশ্ন : শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? জওয়াব : মানুষ যা জানে না তাই শিখবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ জন্মগত ভাবেই অজ্ঞ। সে তার ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। তাই আল্লাহ তাকে অহি-র মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্যের জ্ঞান প্রেরণ করেছেন। যা তার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনার জন্য যথেষ্ট হবে। বাকী তার জৈবিক প্রয়োজনে আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টিরাজির অজানা রহস্য জানার জন্য এবং সেখান থেকে কল্যাণ আহরণের জন্য সে সর্বদা জ্ঞান-সাধনায় লিপ্ত থাকবে। আর নতুন নতুন আবিষ্কারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে সে আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত চিত্তে বলে উঠবে- *'রব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বাত্বিলান সুবহা-নাকা ফাক্বিনা আযা-বান্নার'* 'হে আমাদের পালনকর্তা! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি মহা পবিত্র। তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ জ্ঞান-গবেষণায় এবং শিক্ষা ও কর্মে যত বড়ই হৌক না কেন তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যেই থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাকে অবশ্যই সেখানে তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। অতএব যেন তাকে সেখানে গিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী না হ'তে হয়, দুনিয়াতে সে লক্ষ্যে তাকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং আল্লাহ্র দাসত্বের মধ্যে তার সকল কর্মতৎপরতা নিয়োজিত রাখতে হবে।

এবারে পঞ্চম একটি মৌলিক প্রশ্ন : আল্লাহ মানুষকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? জওয়াব: 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এই বিশ্বাস মানুষকে বহুমুখী আনুগত্যের বিশৃংখল জীবন থেকে মুক্তি দেয় এবং একমুখী আনুগত্যের সুশৃংখল জীবনের প্রশান্তি দান করে।

অত্র আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহ্র দাসত্ব শিখানো হবে, শয়তানের দাসত্ব নয়। আর এটাই হ'ল 'তাওহীদে ইবাদত' যা না থাকলে কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারে না। এক্ষণে ষষ্ঠ ও শেষ প্রশ্ন : আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও তাঁর বিধান সমূহ কোথায় পাব, যা জেনে নিয়ে পথ চলতে হবে? জওয়াব: তা পাওয়া যাবে পবিত্র কুরআনে। যা তিনি স্বীয় করুণা বশে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াতগ্রন্থ হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, *'আর-রহমান'! 'আল্লামাল কুরআন'*। 'পরম করুণাময়'। 'তিনি

শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন' *(রহমান ৫৫/১-২)*। অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের প্রতি ও বিশেষ করে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র দয়াগুণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল তাদের জন্য 'কুরআন' প্রেরণ। কুরআন নাযিল করাই হ'ল বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। কেন? কেননা এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। কুরআনের বিধান সমূহের আনুগত্য করার অর্থই হ'ল আল্লাহ্র দাসত্ব করা। আর সেগুলি অমান্য করার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা ও শয়তানের দাসত্ব করা। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র অবাধ্যতায় মানুষ শয়তানের গোলামী করে। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই দাওয়াত নিয়ে যে, তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং তাগূত (শয়তান) হ'তে বিরত থাক' *(নাহ্ল ১৬/৩৬)*। অতএব মানুষকে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী না করে আল্লাহ ও আখেরাতমুখী করাই হ'ল প্রকৃত অর্থে মানবীয় শিক্ষাদর্শন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সে লক্ষ্যেই ঢেলে সাজাতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

১৪. অ্যানেসথেসিয়া দর্শন[১৪]

অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করলে মানুষ সাময়িকভাবে অচেতন হয়। যদি এই ঔষধ স্থানিক হয়, তাহ'লে রোগী নিজে তার দেহের কাটাছেঁড়ার সবকিছু দেখতে পায়। কিন্তু ঔষধের প্রভাবে সে ব্যথাতুর হয় না বা কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। চেতনানাশক ঔষধ তৈরী হয় ফ্যাক্টরীতে, প্রয়োগ করেন চিকিৎসক এবং ব্যবহৃত হয় রোগীর উপর। রোগীই এর ভাল-মন্দ সবকিছু ভোগ করেন। দেশের জাতীয় জীবনে এমনিতরো চেতনানাশক ঔষধ তৈরী হচ্ছে হর-হামেশা। যা ব্যবহৃত হচ্ছে নিরীহ জনগণের উপর। ভোটের মওসুমে নেতারা সব পাক্কা মুসলমানী পোষাকে হাযির হন। কবরে ফাতিহা পাঠ করে নির্বাচনী সফর শুরু করেন। 'কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন করা হবেনা' বলে তারস্বরে ভাষণ দেন ও নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন। ব্যস এটাতেই বাজিমাত। সরল-সিধা ভোটারগণ এতেই খুশীতে বেহুঁশ। এটাই হ'ল প্রথম চেতনানাশক ঔষধ। যা দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ঘুম পাড়ানো হয়। এর মাধ্যমে জননেতারা আগামী পাঁচ বছরের জন্য জনগণের উপর শাসন-শোষণ, দলীয়করণ, হামলা-মামলা ও যুলুম করার অবাধ লাইসেন্স পেয়ে যান।

---

১৪. আত-তাহরীক ১৪তম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০১০।

দ্বিতীয় চেতনা নাশক সস্তা ট্যাবলেট হ'ল জঙ্গীবাদ। নেতাদের মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে জঙ্গীবাদ জঙ্গীবাদ করে। ফলে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে এবং বিদেশে জনশক্তি রফতানীতেও ধ্বস নেমেছে। তারা শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বদা চারদিকে কেবল জঙ্গী দেখেন। নিরীহ গোবেচারী মহিলাদের ধরে এনেও তাদের এখন জঙ্গী হিসাবে দেখানো হচ্ছে। অথচ দলীয় ক্যাডাররা প্রকাশ্য দিনমানে রাজপথে প্রতিপক্ষ জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশের উপর দাঁড়িয়ে নাচানাচি করলেও ওটা জঙ্গীপনা নয়। যাত্রীবাহী বাসে ওঠে গান পাউডার ছড়িয়ে তাতে আগুন দিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলায় ডজন খানেক তাযা মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করলেও ওরা চরমপন্থী নয়। বাস-ট্যাক্সি ও ট্রেনে ভাংচুর, লুটপাট ও আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দিলেও ওরা সন্ত্রাসী নয়। কারণ ওরা যে গণতন্ত্রী। অথচ হাযার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য যে, বাংলাদেশের মানুষ কখনোই জঙ্গী, সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী নয়। তারা সর্বদা সহনশীল ও শান্তি প্রিয়। তাদেরকে জঙ্গী বানানোর চেতনানাশক ট্যাবলেট তৈরী হয়েছে বিদেশের কোন গোপন ফ্যাক্টরীতে। বাস্তবায়ন হচ্ছে আমাদের দেশে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামই যেন এখন সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। ছাত্রীদের ইসলামী হেজাবের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সরকারী পরিপত্র জারি হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। ইসলামী জালসা বা ওয়ায মাহফিল করতেও সরকারের অনুমতি লাগে। 'কোনরূপ রাজনৈতিক কথা বলা হবে না'- মর্মে মুচলেকা দিয়েই তবে ইসলামী জালসার অনুমতি নিতে হচ্ছে। অথচ বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবই লেখা আছে দেশের সংবিধানে। হ্যাঁ, এগুলি প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে ও ইসলামী নেতাদের চরিত্র হননের ক্ষেত্রে। অথচ সচেতন দেশপ্রেমিক মাত্রই বুঝেন যে, এ দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ আমদানীর মূল হোতা হ'ল পাশ্চাত্যের লুটেরা পরাশক্তি ও তাদের দোসররা। যারা তাদের কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ইরাক ও আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল লুট করা তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক টার্গেট। ঐসব দেশের তেল-গ্যাস লুট করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে এবার তারা এ দেশের তেল-গ্যাস লুন্ঠন করতে এগিয়ে আসছে। সরকারকে বাধ্য করা হবে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য। নইলে সরকারের পতন ঘটাবে তারা তাদের এজেন্টদের দিয়ে। তারা সমুদ্রসীমার নিয়ন্ত্রণ নেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা পূর্ব তিমূরের ন্যায় খৃষ্টান অধ্যুষিত একটি বাফার স্টেট বানাবে। তাই তাদের প্রয়োজন এদেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র অপবাদ দিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে এখানে এসে ঘাঁটি গাড়া। কোন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক নেতা ও সরকার তারা কখনোই চাইবে না। সে যুগে বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলন, সিপাহী আন্দোলন, ফকীর বিদ্রোহ,

মুহাম্মাদী আন্দোলন প্রভৃতিকে তারা সন্ত্রাসী আন্দোলন বলেছিল। এযুগে তেমনি পাশ্চাত্যের যুলুম ও শোষণ বিরোধী ইসলামী আন্দোলনকে তারা জঙ্গী আন্দোলন বলে। অথচ যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের প্রতিরোধ আন্দোলন থাকবেই। বৃটিশ ও হিন্দু জমিদারদের যুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার কারণেই উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের যুলুমের প্রতিবাদেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ইসলামী আক্বীদা ও তাহযীব-তমদ্দুনের বিরুদ্ধে যখনই ষড়যন্ত্র হয়েছে, তখনই তার বিরুদ্ধে ইসলামী জনতা রুখে দাঁড়িয়েছে। আর সেটাকেই লুফে নিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিবলয় নাম দিয়েছে টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ। জনৈক লেখক তাই যথার্থভাবেই বলেছেন, *টেরোরিজম বাই দ্য ওয়েস্টার্ণ, অফ দ্য ওয়েস্টার্ণ, ফর দ্য ওয়েস্টার্ণ*। টার্গেট কেবল ইসলাম ও মুসলমান'। অতএব দেশপ্রেমিক সরকার ও জনগণ সাবধান!

<u>চেতনানাশক তৃতীয় ট্যাবলেট হ'ল</u> নারীর ক্ষমতায়ন। দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারীজাতিকে কর্মহীন রেখে কখনোই দেশ সামনে এগোতে পারে না, একথা নেতাদের মুখে মুখে। অথচ নারীরা যদি গৃহের দায়িত্ব না নিতেন, তাহ'লে পুরুষের পক্ষে বাইরে যাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। পুরুষ বাইরে ৮ ঘণ্টা চাকুরী করে হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ নারী তার গৃহে ২৪ ঘণ্টা কর্তব্য পালন করেন। তার হিসাব কেউ করে কি? নারীর অকপট সহযোগিতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যতীত একজন পুরুষ তার ঘরে, বাইরে ও কর্মজীবনে ব্যর্থ, এ বাস্তব সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন কি? যে পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে না, সে পুরুষ অপদার্থ ও পৌরুষহীন। এরাই ঘরের শোভা নারী জাতিকে পরপুরুষের সাথে কর্মস্থলে আনতে চায়। যা নারীর স্বভাবধর্মের বিরোধী। সংসার ও সন্তান পালনই নারীর প্রধান দায়িত্ব। বাকী সবই অতিরিক্ত। পর্দা ও পরিবেশ নিরংকুশ ও নিরাপদ হ'লে সুযোগমত নারী ইচ্ছা করলে বাড়তি দায়িত্ব পালন করবে, নইলে নয়।

<u>চেতনানাশক চতুর্থ ট্যাবলেটটি হ'ল</u> ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেই সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে সারা বিশ্ব থেকে বিতাড়িত বস্তাপচা সমাজতন্ত্রবাদ। এইসব মতবাদের কথা যারা বলেন, তারা সম্ভবতঃ এগুলির সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য কিছুই বুঝেন না। এগুলিকে বলা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তাহ'লে তারা তাদের পিতা-মাতাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে এইসব চেতনা ছিল কি-না? স্বয়ং শেখ মুজিব, এম.এ.জি. ওসমানী, জিয়াউর রহমান, মেজর জলিল প্রমুখ বরেণ্য নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এই চেতনা ছিল কি? তাদের কোন ভাষণ বা লেখনী উক্ত মর্মে কেউ শুনাতে বা দেখাতে পারবেন কি? বরং উল্টাটাই সত্য। তার প্রমাণ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলে প্রচারিত প্রবাসী সরকারের প্রচারপত্র। যেখানে 'আল্লাহু আকবর' দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এবং শেষে বলা হয়েছে 'সর্ব

শক্তিমান আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন'... *(মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৩য় খণ্ড ২২ পৃঃ)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে আল্লাহ্র নামে ও তার উপর বিশ্বাস রেখে। পুরা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের লিখিত দালিলিক ইতিহাসের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নামগন্ধও নেই। অথচ '৭২-এর সংবিধানে তা যোগ করা হ'ল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে এনে। এতে তো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কাদের স্বার্থে এইসব বানোয়াট থিয়োরীর আমদানী করা হয়েছে।

এক্ষণে জনগণ যদি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হয়, তাহ'লে জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাসের বাইরের কোন মতবাদ এদেশে চলবে কি? নিজেদের বানানো কি বাইরের চাপানো, তা জনগণ দেখবে না। জনগণ যখনই বুঝবে যে, বৃটিশ ও পাকিস্তানীদের মত তাদের নির্বাচিত শাসকরাও যালেম এবং তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তখন আর কোন কিছুরই তোয়াক্কা কেউ করবে না। জনগণের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পুরো ইউরোপীয় শক্তি আজ লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে, এটা দেখেও কি কারু হুঁশ হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থ যদি পরধর্ম সহিষ্ণুতা হয়, তা হ'লে ইসলামেই একমাত্র সে শিক্ষা রয়েছে। সেই শিক্ষার কারণেই বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় দাঙ্গা হয় না। অথচ প্রতিবেশী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের রক্তে প্রতিনিয়ত হোলি খেলা হয়।

অতএব সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের আবেদন, ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন, যা মানবজাতির কল্যাণে নাযিল হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আল্লাহ বরদাশত করবেন না। ইতিপূর্বে 'আদ, ছামূদ, নমরূদ, ফেরাঊন সবাই ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ্র গযবে। আমরাও সেই গযবের শিকার হব প্রধানতঃ সমাজ নেতাদের দুষ্কর্মের কারণে। অতএব তওবা করে ফিরে আসুন আল্লাহ্র পথে। তাহ'লেই আমরা সফলকাম হব *(নূর ২৪/৩১)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

اللهم اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।